গৌরকথা

প্রথম খণ্ড

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গৌর-কথা

প্রথম খণ্ড

দাস—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

মূল্য : ২·৫০

প্রকাশক—

মহানাম সম্প্রদায়

মহাউদ্ধারণ মঠ

৫৯, মানিকতলা মেন রোড,

কলিকাতা-৫৪

মহালয়া

১৩৬৭ সাল, হরিপুরুষাব্দ ৯১

প্রথম সংস্করণ ১৩৬৭—১২০০

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৮—২৪০০

তৃতীয় সংস্করণ ১৩৭৯—২৪০০

মুদ্রাকর—

রাণীশ্রী প্রেস

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ

৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন,

কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীগৌরকথা কীর্ত্তনে শ্রেষ্ঠ পাথেয় শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের করুণা।
দেখিয়াছি, সেই করুণায়-গড়া মানুষ—
শ্রীগৌর-গ্রন্থ ছিল যাঁর কণ্ঠহার,
আচরণে ও প্রচারণে—
নড়িতেন না যিনি একচুল শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে।
সেই প্রথম যুগের বি, এ, ডিগ্রী, শিলং স্কুলের হেডমাষ্টারী,
আভিজাত্যের গর্ব, সকলই ধূলায় ফেলিয়া
মাতিয়াছিলেন যিনি শ্রীগৌর নামে।
মাতাইয়াছিলেন যিনি শ্রীহট্ট কাছাড় মণিপুর পাবনা ফরিদপুর।
শ্রীচম্পটী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ, রাজর্ষি বনমালী রায়ের আচার্য্যপ্রতিম,
ব্রজবিদেহী সন্ত দাসজীর প্রিয় সুহৃদ, শ্রীচরণদাস বাবাজী
মহারাজের পূজ্যপাদ "দেবেন দাদা",
কুকুর মহোৎসবের প্রধান পুরোধা।
আবার কোথায় এসেছেন গোরাশশী, খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে
ফরিদপুরের এক আঁধার কুটীরের দুয়ারে
"জয় জগদ্বন্ধু" বলিয়া বিকাইয়াছিলেন যিনি আপনাকে।
যাঁহার স্নেহ, বৈষ্ণবতা, মহাপ্রসাদ গ্রহণে বিহ্বলতা, নামে তন্ময়তা,
শাস্ত্রে নিপুণতা, নিরুপম গমনভঙ্গি, বচনভঙ্গি
হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে
তিনি
শ্রীশ্রীপাদ জয়নিতাই দেব।
আমার গৌর-কথা দিলাম তাঁর করে।
ঐ কর হইতে একবিন্দু করুণা ঝরিবে
এই লোভে।

পদানত
দাস—মহানামব্রত

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
গৌরাঙ্গচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগং ॥"

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী

হা কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ন'দে-সুধাকর রে ॥
জয় শচীর জীবন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণেশ্বর রে ॥
জয় পুষ্পবন্ত নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গসুন্দর রে ॥
জয় শ্রীবাস অদ্বৈত লোকনাথ গুণধর রে ॥
জয় জগাই মাধাই গৌরীদাস দামোদর রে ॥
জয় হরিদাস রামানন্দ গৌর অনুচর রে ॥
জয় স্বরূপ শ্রীবাস-শ্রীনিবাস দামোদর রে ॥
জয় রূপ রঘুনাথ নরোত্তম বিশ্বম্ভর রে ॥
জয় মুরারি মুকুন্দ বাসুদেব বক্রেশ্বর রে ॥
জয় শান্তিপুর নীলাচল ধাম মনোহর রে ॥
জয় ঠাকুর বৈষ্ণবগণ গুণের সাগর রে ॥
জয় জয় গৌরভক্তবৃন্দ দয়ার সাগর রে ॥
হা গৌরাঙ্গ গদাধর বন্ধুর ঈশ্বর রে ॥

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

"জয় নবদ্বীপ ভারত প্রদীপ"

—বন্ধুবাণী

সসীম মানুষের প্রধাবন অসীমের দিকে। অসীম ভগবানের অবতরণ সসীমের প্রাণপুরে। মানুষ উঠে, ভগবান নামেন। মাঝপথে দেখা হয় দু'জনায়। মানুষ ছুটে সাধনায়, ভগবান ছুটেন করুণায়। মিলন ঘটে খেয়ার ঘাটে। মানবের প্রয়াস, ঈশ্বরের প্রসাদ। এই যুগল-পটে সাক্ষাৎকার।

মানুষের উন্নয়নের চরমতা ভগবত্ব লাভে। ভগবানের অবতরণের চরমতা মানবত্ব লাভে। যে মানুষ ভগবত্তুল্য সে মহীয়ান্। যে ভগবান মানব-তুল্য সে মনোহারী। ভূলোকের মানুষের গোলোকপ্রাপ্তি তীব্র তপস্যার পরিণতি। গোলোকের দেবতার ভূলোকে গতাগতি কৃপা-ভাগীরথীর অমিত প্রগতি।

সাধন বলে মানুষের ভগবত্ব লাভের সংবাদ দিয়াছেন, বেদ উপনিষদ্। "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইহা বৈদান্তিকের গবেষণা। অসীম কারুণ্যে ভগবানের মানবত্ব লাভের সংবাদ দিয়াছেন নদীয়ার সুরধুনী তট। "সর্ব্বোত্তম নরলীলা" ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ঘোষণা। বেদের সংবাদ মানুষকে করিয়াছে জ্ঞানবান, ভাবুক। নদীয়ার সংবাদ মানুষকে গড়িয়াছে প্রাণবন্ত, প্রেমিক।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব আছে ইহা মানবতার মহিমা। ঈশ্বরের মধ্যে মানবতা আছে ইহা ঈশ্বর তত্ত্বের মধুরিমা।

সাধক ঈশ্বরকে চায়, চাহিতে চাহিতে ঈশ্বরের স্বধর্ম্মতা লাভ করে। "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই গান গাহিয়াছেন ভগবদ্গীতা ভগবান ভক্তকে চান। চাহিতে চাহিতে ভগবান ভক্ত হইয়া যান। ভক্তের ভূমিকায় ভগবান নাচিয়া চলেন নদীয়ার রাজ-পথে। এই কাহিনী শুনাইয়াছেন অমৃতময় বৈষ্ণব সাহিত্য।

আনন্দে মানুষ হয় আত্মহারা। আত্মহারা অবস্থাতেই আনন্দের পূর্ণ সম্ভোগ। আপনাকে হারাইয়াই প্রাপ্তি। আত্মহারা হইলেই আত্মদর্শন। আত্মদর্শনই আনন্দের নিদান। ভগবানও পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করেন আত্মহারা হইলেই। ভগবত্বই ভগবানের আত্ম। ভগবান যদি ভগবত্ব হারাইয়া ফেলেন তবেই প্রকটিত হয় তাঁহার আনন্দের পূর্ণ স্বরূপতা।

ভগবানেরও আছে একটা মহা সাধনা। তাঁহার লক্ষ্য স্ব-স্বরূপের আস্বাদন। খুঁজিয়া বেড়ান তিনি আপনি আপনাকে। অনন্ত বিশ্বের প্রকাশ সেই অনুসন্ধানের মহাফল। তবু ঘটে নাই চরম প্রাপ্তি, খোঁজ চলিতেছেই, বিরতি বিহীন। খুঁজিতে খুঁজিতে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেন নূতনরূপে। "তদাত্মানং সৃজাম্যহং।" খুঁজিয়া তখনই আপনাকে পান, যখন সর্ব্বতোভাবে আত্মহারা হইয়া যান।

ভগবান স্ব-স্বরূপ আস্বাদনে সিদ্ধকাম তখনই, যখন নিজ ভগবত্ব হারান। যখন পূর্ণ মানুষ হইয়া নিজ মধুরিমার অনুসন্ধানে মগ্ন থাকেন। এই বার্ত্তার বাহক নবদ্বীপ ধাম। আপনাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে পূর্ণ মানুষ হইয়া নদীয়ার মাটিতে উদিত হইয়াছেন স্বয়ং ভগবান। কত সুন্দর হরি,

জানিবার জন্য হরি, পুরটসুন্দর দ্যুতি লইয়া পথে পথে কাঁদিতেছেন হরি হরি বলিয়া। এই সংবাদ অশ্রুতপূর্ব। নদীয়ার এই সন্দেশ মানব-সমাজের হস্তে অভিনব অবদান।

ভগবান সর্ব্বজ্ঞ, জানেন সবই। কেবল জানেন না তিনি নিজে কত সুন্দর। গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন কত কথা। বলেন নাই কেবল নিজ মাধুর্য্যের বার্ত্তা। বলেন নাই তাঁহার স্বরূপে কত আনন্দের ঘনতা, তাঁহার রূপে কত প্রীতির মধুরতা, তাঁহার বংশীতে কত মর্ম্মস্পর্শী মাদকতা, তাঁহার প্রেমে কত প্রাণ মাতান উদ্বেলতা। বলেন নাই, বলিতে পারেন নাই। উহার অনুভূতি নাই, অনুমিতি আছে, তাই বলা হয় নাই।

যাহা নিজের বুকে তাহার হয় অনুভূতি। যাহা অপরের মুখে তাহার হয় অনুমিতি। আমার হৃদয়ের সন্তাপ আমার অনুভূতি। তোমার হৃদয়ের সন্তাপ আমার অনুমিতি তোমার আর্ত্তনাদ-রূপ হেতুর মাধ্যমে সুসিদ্ধ। শ্রীভগবানের নিরুপম সৌন্দর্য্যের কথা, অনির্বচনীয় মাধুর্য্যের কথা, অসমোর্দ্ধ লীলাতত্ত্ব গাথা, তদ্বিষয়ক অনুভূতি আছে একমাত্র ভক্তজনের। সর্বাধিক, সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ব্রজজনের। সর্বাতিশায়ীরূপে আছে ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর। শ্রীরাধার সঙ্গে সহ অনুভূতি ছাড়া আর উপায় নাই উহা ভোগ করিবার। এই সহানুভূতি পাইবার লোভে গোবিন্দ আসিলেন নদীয়ায়, শ্রীরাধাঠাকুরাণীর মহতী ভূমিকায়।

এক মধুবাসন্তীর পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপে গঙ্গার তটে প্রকট হইয়াছিল ঐ মহা অভিনেতা। সেদিন হোলীর বিলাসে

আকাশ ছিল রঙ ধরা। চন্দ্রগ্রহণের উল্লাসে বাতাস ছিল কীর্ত্তন-মুখর। ন্যায় চর্চ্চার শুষ্কতায় মানুষের জীবন ছিল তৃষ্ণাব্যাকুল। জীব-জগতের দুঃখের তীব্রতায় অদ্বৈত ঠাকুরের নয়ন ছিল অশ্রুসঙ্কুল। গোলোকের ভালবাসা ছাড়াইয়া দিতে, মর্ত্ত্যের ভালবাসা লুটিয়া নিতে, শ্রুতির "রসো বৈ সঃ" মূর্ত্তি ধরিয়াছিল আসিয়া শচীজননীর অঙ্কদেশে। রূপে তাঁহার নরনারী হইয়াছিল লুব্ধ। গানে তাঁহার বন্য হিংস্র জন্তু হইয়াছিল মুগ্ধ। বীরত্বে বিধর্ম্মী হইয়াছিল ত্রাসিত, ঔদার্য্যে বিরোধী হইয়াছিল ক্রোড়গত। তাঁহার বিদ্যাবত্তায় দিগ্বিজয়ী কম্পান্বিত। স্বরূপ প্রদর্শনে সার্বভৌম পদানত। তাঁহার দৈন্য বিনয়ে প্রকাশানন্দ বিমোহিত। প্রেম-কান্নায় শিলা বিগলিত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল হিমাচলের মত, তাঁহার পাদমূলে সমাশ্রিত ছিল হীন পতিত দীন কাঙাল কত শত অগণিত। তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল না এমন মানুষটি ছিল না সেই যুগে সারা দেশে। দাতা শিরোমণির দানে ধন্য হইয়াছিল বিশ্বের নরনারী।

দান করিলেই দাতৃত্ব হয় না। স্ত্রী পুত্রকে মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার প্রদানে কেহ দাতাপদবাচ্য হয় না। আবার পথের কাঙালদের মুষ্টি আধলা পয়সা ছড়াইলেও প্রকাশ পায় না কোন বদান্যতা। অতি মূল্যবান সম্পদ যদি বিতরণ করা যায় পথে-ঘাটে যারে তারে অবিচারে অকাতরে, তবেই বলি দাতা-শিরোমণি। নদীয়ার ঠাকুর আমার, বিচার করেন নাই পাত্রা-পাত্র, ভেদ দৃষ্টি রাখেন নাই আত্ম পরে, ভাবনা করেন নাই দেয়াদেয়, অপেক্ষা করেন নাই সময়ের। মহাসাধন দুর্লভ যে

প্রেমভক্তিরস তাহা যত্রতত্র, যাকে তাকে প্রদান করিয়াছেন। তাই তো বদান্য-শিরোমণি!

প্রেমের গতি উভয়মুখী। ভক্ত ধায় ভগবানের দিকে, ভগবান আসেন ভক্তের দিকে। ব্রজে শ্যামসুন্দরের দিকে শ্রীরাধা করিয়াছেন অভিসার, শ্যাম অহর্নিশি অনুধ্যান করিয়াছেন ভানুবালার স্নেহ-পারাবার। দুই মিলিলে ছুটাছুটি ঘুচিয়া যায়। ব্রজে রাধাগোবিন্দ মিলনে লীলার উপসংহার। নদীয়ায় এইখানেই উপক্রমণিকা। ছুটাছুটি নাই যাঁর, তিনি ছুটিয়াছেন, খোজাখুঁজি নাই যাঁর, তিনি খুঁজিতেছেন। হাসির ঠাকুর কাঁদিতেছেন। সম্ভোগরসের ঘনমূর্ত্তি বিপ্রলম্ভে ঝুরিতেছেন। এই চমৎকারিতা তুলনাবিহীন। পূর্ণতমের অপূর্ণতার রোদন মহারহস্যময়। নদীয়ার অবতারীর অশ্রু প্রবাহে বিনির্ম্মিত হইয়াছে প্রেমভক্তির এক অভিনব সরণি। সেই মহাদানের দিকে দৃষ্টি করিয়া গৌরোদ্গান সরস্বতী শ্রীপ্রবোধানন্দ লিখিয়াছেন :—

রক্ষো দৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং, যোগাদিবর্ত্মক্রিয়া-
মার্গো বা প্রকটিকৃতং কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা-
ভক্তের্বর্ত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমঃ॥

নরসিংহরূপে রামরূপে বধ করিয়াছেন দৈত্যকুল রাক্ষসকুল। তাহাতে এমন কি হইল? যোগাদি সাধন মার্গের ক্রিয়াপথ প্রদর্শন করিয়াছেন সিদ্ধ কপিলদেব, তাহাতেই বা কি হইল?

ব্রহ্মারূপে তিনি সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে করেন পালন, সংহার করেন রুদ্ররূপে—তাহাতেই বা বিশেষ কি হইল ? ভারাক্রান্তা মেদিনীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বরাহরূপে তাহাতেই বা এমন বিশেষ কি হইল ?

এই ঘোর কলিযুগে পরম প্রেমোচ্ছল প্রেমভক্তির মহাসুগম যে অপূর্ব্ব পথ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন যিনি জীব জগৎকে, সেই চিদানন্দঘন গৌরাঙ্গসুন্দরের দানের তুলনা কোথায় ? তাই নবগৌর শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন,—

"জয় নবদ্বীপ ভারত প্রদীপ"

এই ভারতের বিরাট সংস্কৃতির যাহা কিছু সম্পদ তাহা যথার্থভাবে দর্শন করিতে হইলে নবদ্বীপের আলোই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোজ্জ্বল আলো। সেই আলো দর্শন করিতেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রচেষ্টা। ভারতীয় তথা মানবীয় যাহা কিছু মহৎ অবদান তৎ সমুদয় মহাপ্রভুর কৃপালোকেই দেখিবার সাধ।

ভক্তকৃপাই সম্বল। জয় গৌরহরি। জয় বন্ধুহরি।

—গ্রন্থকার

———

প্রার্থনা

"কৃষ্ণ-মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু"—গৌরলীলায় সেই মাধুরীর চাতুরীতে হরিপুরুষের উদয়। কৃষ্ণলীলা এবং গৌরলীলা একটির সহিত অপরটির সম্বন্ধ চিন্ময় আনন্দরসের সমুজ্জ্বলতায় প্রেমের দেবতার ব্যক্তভাবে সর্ব্বাতিশায়ী প্রভাব। এমন প্রভাবের প্রভবতত্ত্বটি নিত্যভাবে আস্বাদন করিবে কেবল কলির জীব। তাহাদের এমনই সৌভাগ্য। কলিযুগে "নামরূপে কৃষ্ণ অবতার"। ভাগবত বলিয়াছেন, কলিযুগে জীবের কিছুই করিবার নাই। ভগবানের নামটি শুনিবার জন্য কান বাড়াইয়া দিলেই জীবের কার্য্য সিদ্ধ হইল। এ যুগে এতই সুযোগ, এমনই অযাচিত কৃপার কারবার। কিন্তু আমার মত অধম জীব ভগবানের এমন কৃপার দিকে তাকায় না। তাঁহার প্রেমের কথা স্মরণ করে না। তাঁহার নাম শুনিবার জন্য কান বাড়ায় না। পক্ষান্তরে যেখানে নাম সেখান হইতে দূরে সরিয়া যায়।

কিন্তু নামী তো নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি নাম শুনাইবেনই। জীব তাঁহাকে চাহে না, তথাপি জীবকে তিনি চাহেন। জীব তাঁহাকে ভজনা করিবে না, তথাপি জীবকে ভজনা করিবার জন্য তিনি আকুল উৎকণ্ঠাভরে ব্যাকুল। জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি নাম বিলাইবেন। এ যুগে তাঁহার এমনই দায়। প্রেয়সীর বশে পড়িয়া ভাবের বিলাসে তাঁহাকে

এমনভাবেই ভাসিয়া যাইতে হইতেছে। ব্রজবিহারী যিনি হরি, এ যুগে জীবের দুঃখে হরিনাম শুনিবার জন্য—জীবকে হরিনাম শুনাইবার জন্য তাঁহার এমনই আথাড়ি-বিথাড়ি।

নামদাতা নামীর প্রেম-লীলার এই প্রভাবেই শ্রীমান্ মহানামব্রতের ন্যায় মধুর মানুষটিকে আমরা পাইয়াছি। বলনে মধুর, চলনে মধুর, বচনে মধুর নয়নে মধুর। মহানামের সকলই মধুর। "সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব ঠাকুর, নয়নে শ্রবণে মনে বচন মধুর।" বাঙ্ময় তনুকে আশ্রয় করিয়াই তো চিন্ময়-লীলা। মহানামব্রতজী কৃষ্ণকথা, গৌরকথার মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি। কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা এমন মধুর করিয়া কই আর কাহারো মুখে শুনিয়াছি কি? মহানামের মুখে হরিকথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের তরঙ্গ অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। চিন্ময় আনন্দসুখে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার শ্রীভগবানের মাধুর্য্য সম্বন্ধে ছন্দায়িত হয়। আর এমন যিনি মধুগাতা, মধুদাতা সুরে সুরে যিনি মধুর দেবতার আত্মভাবটি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে উদ্দীপ্ত করিলেন, সেই বৈষ্ণব ঠাকুরটিকে কোলে বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়; ইচ্ছা হয় হৃদয়ের ভিতর তাঁহাকে পুরিয়া রাখি, ছাড়িতে না হয় এমন করিয়া তাঁহাকে পাকাপাকি মাখামাখিতে পুরা করিয়া পাই। বলিতে কি, মর্ত্ত্য-সম্বন্ধের বিচার তখন থাকে না। সাধ হয় পায়ে গিয়া পড়ি। প্রাণ চায় চরণের ধূলা লুটিয়া লইয়া সর্ব্ব অঙ্গে মাখি, তবে বুঝি তাপিত জীবনের জ্বালা জুড়ায়। কেন এমনটি ঘটে, ভাবিয়া পাই না। আমার মত জীবের এই সব ভাব তো হইবার কথা

নয়! একি তবে হরিপুরুনেরই উদয়! সেইজন্যই এমন হয়? প্রভু জগদ্বন্ধুর বিশেষ অনুগ্রহেরই কি প্রভাব? মহাউদ্ধারণ সে লীলা। অধম, পতিত সকলে সে লীলার মাহাত্ম্যসম্বন্ধে নামে প্রেমে উন্মত্ত হয়। মহানামের মুখে আমরা প্রভুর সেই কৃপার প্রত্যক্ষ সংবেদন অনুভব করি। ভরসা জাগে, মনে হয়, তবে ভয় নাই; আমি যতই পতিত, পাপী হই না কেন, প্রভু আছেন। প্রভু তো একদিন আমাদিগকে অভয়মন্ত্রে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কলির জীবের সাধ্যবস্তুকে তিনি নিজের জীবনে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তনছন্দে আমরা শুনিয়াছিলাম—

"তরঙ্গ উত্তাল, তিমির বিশাল,
দিনকর অস্তে যায়।
তমস্বিনী ঘোরা, সন্ধ্যাসনে ভোরা,
হের সমাগতা প্রায়॥
কলুষ-নয়ন, কর উন্মীলন,
সম্মুখে প্রলয় হ'ল।
ঊর্দ্ধ বাহু করি, শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি,
জয় জয় রাধে বল॥"

মহানামের গৌরকথায় সেই নামদাতা, প্রেমদাতা দয়ার অবতার দেবতাই আমাদের চিত্তে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছেন। "আজানুলম্বিত দুই ভুজ ঊর্দ্ধে করি, প্রেমভরে সঘনে বোলয়ে হরি হরি" প্রত্যক্ষ করিতেছি এই মাধুরী। প্রভু জগদ্বন্ধু-

সুন্দরের কৃপারই যে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে এই সংবেদন—কৃষ্ণনাম গৌরনামের এমন স্ফূরণ! জয় প্রভু জগদ্বন্ধু জয়। জয় তাঁহার কৃপা-ধন্য মধুর নামদানে বদান্যব্রত মহানামের জয়। নাম-রসে তিনি আমাদিগকে সতত সঞ্জীবিত রাখুন। তাঁহার বচন-সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া যেন মানব-জন্ম ধন্য করিতে পারি, এই প্রার্থনা।

বৈষ্ণব পদরজঃ প্রার্থী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

অযাচিত কৃপা

বক্ষ্যমান "গৌরকথা" গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ে কিছু বলার অধিকার আমার নেই। এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার স্পৃষ্টতাও আমি রাখি না। আর আমার মত অখ্যাত অজ্ঞজনের প্রশংসাপত্রের এমন কোন বাজার-মূল্যও নেই যে, তা পয়সা খরচ করে ছাপানোর কোনরূপ সার্থকতা আছে। তথাপি আমার যে স্বতঃপ্রবৃত্ত এই লেখা তার একটু ইতিবৃত্ত আছে।

দিনকয়েক আগের কথা। বাগবাজারে শিশিরদার (ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছি। সঙ্গে আছে শ্রীমতী কৃষ্ণা মৌলিক, এম এ, বি টি। কৃষ্ণা বেলঘরিয়া প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও শিশিরদার অত্যন্ত স্নেহভাজনীয়া। সম্প্রতি মাতৃবিয়োগ হয়েছে তার। শোকে ব্যথাবেদনায় মুহ্যমানা—একবারে ভেঙ্গে পড়ছে। কৃষ্ণাকে দেখেই শিশিরদা চম্‌কে উঠলেন। তার শরীর দেখিয়ে ইঙ্গিতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, এ কি হয়েছে! শিশিরদা এক যুগেরও অধিক মৌনী। কথা বলেন না। একটু চট্‌পটে স্বভাবের মানুষটি। যেই কথা সেই কাজ। একগাদা কাগজ-পত্রের ভীড়ের মধ্য থেকে একটি লেখা বের করে কৃষ্ণার হাতে দিলেন ও ইঙ্গিত করলেন সজোরে পড়তে। পড়লও কৃষ্ণা চমৎকার। "ভগবানের মুখে যুদ্ধের কথা কেন" শীর্ষক রচনা। ডক্টর মহানামব্রতের চতুর্থ খণ্ড "গীতা-ধ্যান" গ্রন্থের ভূমিকা।

গ্রন্থকার শ্রীহট্ট থেকে লিখে পাঠিয়েছেন। লেখাটি আমি "প্রবর্ত্তক" পূজা সংখ্যার জন্য নিয়ে এলাম।

কৃষ্ণার পড়া শেষ না হতেই "গৌরকথা" বই-এর "জয় নবদ্বীপ, ভারত-প্রদীপ" শীর্ষক প্রথম লেখাটি পুনশ্চ জোরে পড়তে কৃষ্ণাকে ইঙ্গিত করলেন শিশিরদা। গ্রন্থের এইরূপ সুনির্ব্বাচিত দু'তিনটি অংশ পড়ালেন। পড়তে-পড়তে কৃষ্ণা একবার স্বগতভাবেই উচ্চারণ করলো, চমৎকার! পড়া শেষ হ'তেই বইখানা নামিয়ে রেখে মুগ্ধবিস্ময়ে কৃষ্ণা মন্তব্য করলো: "গৌর-কথা নয়তো যেন গৌরমন্ত্র। এমন মন্ত্রদাতার কাছেই গৌর-দীক্ষা নিতে হয়!"

শিশিরদা এক টুকরো কাগজে লিখে দেখালেন, "মহানাম-ব্রতের পাঠ শোননি তো—কি মধুর!"

"কোথায় শোনা যায়"—কৃষ্ণার সাগ্রহ প্রশ্ন।

বললাম আমি, এইটাই নির্দ্দিষ্ট করে বলা কঠিন। আজ এখানে, কাল সেখানে। তাঁকে ধরতে হ'লে এক বছরের অগ্রিম ডায়েরী কণ্ঠস্থ রাখার দরকার।

শিশিরদা নাঁকি স্বরে উঁহু উচ্চারণ করলেন। তারপর পুনশ্চ লিখলেন: "আচ্ছা আমি খবর দিব। রাসের সময় মহানামব্রত পনের দিন এক নাগাড় ভাগবত পাঠ করেন।"

"গৌরকথা" বইয়ের প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠলো। আমি বললাম, শিশিরদা জানেন না আপনি, এই বই ছাপানোর পেছনের অব্যক্ত কাহিনীটুকু, যার সঙ্গে আমি জড়িত এবং যার জন্য আমি লজ্জিত ও আজও নিজেকে অপরাধী মনে করি।

১৩৬১-৬২ সালে যখন বিভিন্ন শীর্ষকে এই মহাপ্রভু সম্পর্কিত রচনা শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয় তখনই এই লেখার প্রতি আমার বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সুগভীর গৌরতত্ত্ব এত মধুর করে বলা যায়, তা আমার ধারণা ছিল না। ইতিপূর্ব্বে এমন সহজ প্রাঞ্জল পরিবেশন আর কোথাও আমার চোখে পড়েনি। মাসের পর মাস এই লেখাটির জন্যই নিতাইসুন্দর পত্রিকার আগমন অপেক্ষায় থাকতাম। উদগ্র কৌতূহল এমনি ছিল যে, অপ্রাপ্ত সংখ্যা পাঠবাড়ীতে নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছি। লেখাটির সম্পূর্ণ একটা ফাইলও করেছিলাম। অনেক চক্রে বৈঠকে, সভা-সমিতিতে ডক্টর মহানামব্রতের এই "গৌরকথা'র মর্ম্ম আমি ব্যক্ত করেছি। যাঁরা শুনেছেন তাঁরাও পরম পরিতৃপ্ত হয়েছেন।

তারপর একদিন ডক্টর মহানামব্রতজীর কাছে এই লেখা প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স হ'তে পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রস্তাব করলাম। তিনিও সানন্দে সম্মতি দিলেন। বললাম, কপিটার পুনর্সংশোধন ও পুনর্ব্বিন্যাস বিষয়ে আপনার একবার দেখা দরকার। একটা সর্ত্তও স্থির হওয়া চাই।

শেষোক্ত প্রস্তাব বিষয়ে তিনি ভরসা দিলেন, ওতে কিছু আটকাবে না। আমার ওপর নির্ভরতার ভাবটিই তাঁর কথায় ফুটে উঠলো। কপি দেখা সম্পর্কে বললেন, সময় কম, আচ্ছা দেখব, তবে বেশী কিছু করার নেই।

প্রায় বছরখানেক হবে। মানিকতলা উদ্ধারণ মঠে ব্রহ্ম-চারিজীর খোঁজে গিয়েছি। কি একটা উৎসব ছিল। মঠের

আঙ্গিনায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। তিলধারণের স্থান নেই। কে একজন বললে, তাঁর তো আজই আসার কথা। সময় হয়ে গেছে। বোধহয় ট্রেন 'লেট্'।

একটু পরেই এলেন তিনি। মঠের সামনের রাস্তায় রিক্সা এসে দাঁড়াল। একরাশ মোটঘাটের মধ্য থেকে নামলেন। অনেকেই প্রণাম করলো। আমিও করলাম। আঙ্গিনার সামনের একটি ঘরে এসে বসলেন। হাতে জপের মালা। না স্থিতি হতেই কর্ম্মকর্ত্তা ছু'একজনের সঙ্গে রওনা হবার কথা হল সুরু। তখনই ওয়াকিবহাল একজন ছুটলো প্লেনের টাইম-জানা ও বুকিং-এর জন্য। হাতমুখ ধোবার জন্য এবার উঠবেন। এমনি সময় সংক্ষেপে চন্দননগর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে নেবার নিবেদনটি জানালাম। বই-এর কথাও বললাম।

উঠতে-উঠতেই উত্তর করলেন, আপনিই যা ভাল বোঝেন সেই ভাবে ছাপতে সুরু করুন। প্রুফটা মঠ হ'তে ঠিকানা জেনে আমায় পাঠাবেন।

তারপর অনেকদিন কেটে গেল। খানিকটা যোগাযোগের অভাব, খানিকটা আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং বিচিত্র ব্যস্ততায় "গৌরকথা" প্রকাশ করা আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অব-চেতনায় একটা অপরাধের গ্লানির আচ্ছন্নতা অনুভব করে আসছি সেই থেকে।

থামলাম আমি। শিশিরদা ইঙ্গিতে বললেন, না ছেপে ভাল করেন নি। ছাপলে বিক্রিও হ'ত।

বললাম রাত্রি হয়ে গেছে। এবার উঠি। শিশিরদা

কৃষ্ণার কোলের ওপর দু'খানা বই "গীতাধ্যান" ও "গৌরকথা" ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর লিখে দেখালেন, "মন দিয়ে পড়বে ও অনুধ্যান করবে।"

পথ চলতে চলতে কৃষ্ণা বললে, "আশ্চর্য্য, দেখুন আমার বুকের মধ্যেকার গামছা-নিংড়ানো বেদনার ভারটা যেন চলে গেছে।'

বললাম, "তা না হ'লে গৌরহরির সন্তাপহারিণী মহিমাই বা কি!"

"কিন্তু এম এ পরীক্ষায় বৈষ্ণব-পেপারে গৌর-প্রসঙ্গ তো কতই পড়েছি পরীক্ষাও দিয়েছি, কিন্তু কৈ গৌরসুন্দরের এমন মধুর আস্বাদ তো মেলে নি!"

বললাম, "সে লেখা-পড়া-পরীক্ষা সবই বুদ্ধির ভূমিকায়। আর এক্ষেত্রে গৌর-কথা রস-সংপুটিত হয়ে উদ্গীর্ণ হয়েছে অনুভবী ডক্টর মহানামব্রতের কলমের ডগায়। তাঁর নিজ আস্বাদনের সংবেদন-বেগ গৌরকথার প্রতি অক্ষরে উপচে পড়েছে, অভিষিক্ত করেছে। এ পরীক্ষা-পাশের নোটবুক নয়, ব্রহ্মচারীর গভীরতম সত্তার বেদনাসিঞ্চিত রচনা। তাঁর কথার মধ্যেকার বেদনা মর্ম্মী পাঠকের চেতনা নাড়া দিবেই দিবে।"

"সে কি রকম? বলার ভঙ্গী ভাল অনেকেরই থাকে, কথার চাতুরীও বুঝি, কিন্তু বেদনাসিঞ্চিত কেমন করে হয়?"—কৃষ্ণা প্রশ্ন করলে।

চলতি পথ, চারদিকে যানবাহনের গতায়াত। সংক্ষেপেই

উত্তর দিলাম, "ধর তুমি গৃহে বসে আছ। পাঁচজন এসে তোমাকে একই ঘটনার সংবাদ দিলে যে, অর্দ্ধ-উলঙ্গিনী এক যুবতী রাস্তার মোড়ের ডাষ্টবিন থেকে ফেলে-দেওয়া অন্ন খুঁটে খাচ্ছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য। চারজনের কথায় তোমার চিত্তে কোন সাড়াই তুললো না, অথবা এই দারিদ্র্যের হেতু-বিচারের প্রবৃত্তি এল, কিন্তু একজনের কথায় তুমি একখানি পুরোনো কাপড় আর কিছু খাবার নিয়ে ছুটলে ভিখারিণীকে দিতে। শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তার হৃদয়-সংবেগ ও অনুভূতির উত্তাপ না থাকলে তা প্রভাব সঞ্চার করতে পারে না।"

ইতিমধ্যে ৩২ নং বাস এসে বাগবাজার পুলের কাছে দাঁড়ালো। আমরা বাসে উঠলাম।

বাস থেকে নেমে কৃষ্ণা পুনশ্চ প্রসঙ্গ তুললো। বললো "এমন সুন্দর বই যিনি লিখেছেন তিনি নিশ্চয়ই চমৎকার মানুষ হবেন?"

বললাম, "খাটোখুটো মানুষটি। হ্রস্বাবয়ব। তেমন দর্শন-ধারীও নয়। সঙ্গীতের কণ্ঠও নয়। সংস্কৃতে শ্লোক-উচ্চারণের চাতুর্য্যও কম——"

বাধা দিল কৃষ্ণা। বললে, মহাপুরুষের নিন্দা মহাপাপ।

"তথাপি", বললাম আমি, "দেশে-বিদেশে যেখানেই ডক্টর মহানামব্রত বক্তৃতা দিয়েছেন বা ভাগবত ব্যাখ্যা করেছেন সেখানেই

শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছেন এবং আরও শোনার তৃষ্ণা বেড়েছে। তাঁর ভাগবত কথার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে জানি যে, শ্রোতাদের এমন একটি লোকও দেখিনি যিনি প্রশংসামুখর হননি। এমনটি হবার কারণ এই যে, আত্মনিবেদিত বক্তার বক্তব্যের মধ্যে ব্যক্তিত্ব মুছে গিয়ে নৈর্ব্যক্তিকের মাধুর্য্যময় স্বপ্নটিই ব্যক্ত মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। আর পরম কারুণিকের সনাতন করুণার স্পন্দন ছড়িয়ে পড়ে শ্রোতার চিত্তে-চিত্তে। ডক্টর মহানামের চমৎকারিত্ব এইখানে।"

গৃহে প্রবেশ করেই কৃষ্ণা 'গৌরকথা'র পাতা উল্টাতে-উল্টাতে এক স্থানে পড়তে সুরু করল। বলল, একটু শুনুন কি চমৎকার!

বুঝলাম, কৃষ্ণাকে গৌরনেশায় পেয়ে বসেছে।
রাতও হয়েছে। অপেক্ষা না করে আমি উঠলাম।

দিন দশেক পরে। অফিসের কাজে ব্যস্ত। মহাউদ্ধারণ মঠের কৃষ্ণকুমার দাসজী একখানা পত্র এনে দিলেন। শিশিরদার পত্র! লিখেছেন, "গৌরকথা"র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে গোটাকয়েক অভিমত দিতে চাই। ভাবতে ভাবতে আপনার কথা মনে পড়লো। আজকেই লিখে দেওয়া চাই।

পূজোর প্রবর্ত্তক নিয়ে ব্যস্ত। এতটুকু সময় নেই। আর গৌরকথা সম্বন্ধে অভিমত দিবার যোগ্যতাও নেই। তথাপি শিশিরদার এই আহ্বানের মধ্যে অনুভব করলাম অকিঞ্চন বৈষ্ণবের অহেতুক কৃপা। এতদিনে আত্ম-অপরাধ প্রকাশ্যে

ঘোষণা করার সুযোগ দিয়ে বুঝি বা মহানামব্রতজী এ অধমকে অপরাধ-মুক্ত করলেন।

পরিত্রাণের পরিতৃপ্তিতে অন্তরটা ভরে গেল। শির আপনা-আপনি নত হয়ে এল এই বৈষ্ণব মহাজনের শ্রীচরণকমলে।

শ্রীশ্রীরাস পূর্ণিমা '৬৮

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
(সম্পাদক : প্রবর্ত্তক)

গৌরকথা সম্বন্ধে শ্রীসুদর্শন বলেন ঃ

গৌরের জীবন-কথা শুধু কথা নহে। ঘটনার দিন পঞ্জিতে সে জীবনের তাৎপর্য্য খুঁজিতে গেলে তাহা পাওয়া যাইবে না —যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন. ভগবান রসস্বরূপ। গৌর সেই রসেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। রস আস্বাদ্য—বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। গ্রন্থকার সেই আস্বাদ্য বস্তু গৌরতত্ত্বের রসমাধুর্য্যই তাঁহার অনবদ্য ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থে রূপায়িত করিয়াছেন। রসিক-জনের অপরিমেয় ভোজ্য এই গ্রন্থ—স্বাদু স্বাদু পদে পদে। গৌরতত্ত্বের এমন অপূর্ব্ব রূপায়ণ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়িতেছে না। গ্রন্থকার যে গৌররসে রসিক এবং গৌররসের সাগরে ডুবিয়া অনুভূতির কত বিচিত্র মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পাঠক-মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দাতাশিরোমণি গ্রন্থকার তাই গৌরতত্ত্ব-রসের ভাণ্ডার তিনি উন্মুক্ত করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থের মারফতে সর্ব্বসাধারণের জন্য। অযাচিত এই দান—গ্রহণে গ্রহীতা কৃতার্থ হইবে। আমরা ভক্তিবিনম্র চিত্তে দু'হাত পাতিয়া এই দান গ্রহণ করিলাম। সুধী, ভক্ত ও রসিকজনকে এই দান গ্রহণে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব গ্রন্থ

গীতা-ধ্যান

গীতা-ধ্যান সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত।

উদ্বোধন বলেন—

শ্রীযুক্ত মহানামব্রত ব্রহ্মচারী "গীতা-ধ্যান" বিরাট গীতা-সাহিত্যে এক নূতন সংযোজনা।—গভীর আগ্রহে সহিত নূতন আলোর আশায় তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া লাভবান্ হইয়াছি। * * *

গীতা যে কেবল সন্ন্যাস-শাস্ত্র নহে, কেবল কর্ম্ম-শাস্ত্র নহে, কেবল ভক্তি-শাস্ত্র নহে ইহা যে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমুচ্চয়-শাস্ত্র অতি নিপুণতা সহকারে গ্রন্থকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। *

দৈনিক বসুমতী বলেন—

* * * রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, "গীতার ঠিক ইতিহাসটি পাওয়া গেলেই ওর হেঁয়ালীর মীমাংসা পাওয়া যেত। গীতার মধ্যে কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে। তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়েছে।" "গীতা-ধ্যান" পড়লে এই বিরোধের সমাধান হয়। *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, পি-এইচ-ডি বলেন—

"গীতা-ধ্যান" বইখানি পরম আনন্দ ও আগ্রহের সহিত

পাঠ করিয়াছি। হিন্দুর মহাগ্রন্থ এই গীতাকে আপনি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছেন ও ইহার উপর সম্পূর্ণ নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। * * *

আপনার গ্রন্থখানি শ্রোতার দিক হইতে লেখা—ভগবানের বাণী শ্রোতার মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিল, তাহার কোন্ সংশয় নিরসন করিল, তাহার কোন্ অস্পষ্ট পরস্পর-বিরোধী অনুভূতিকে সুস্পষ্ট উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত করিল, তাহার মনের আঁধার কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কাটিয়া সেখানে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সূর্য্যালোক জ্বলিয়া উঠিল, আপনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহাই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। * * *

সুসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন—

আপনার **"গীতা-ধ্যান"** এক বিস্ময়কর গ্রন্থ। গীতার অন্তর্নিহিত অভ্রান্ত অর্থটিকে উপলব্ধির সহজ আলোতে উদ্ঘাটিত করেছেন। * * *

গীতা-ধ্যান

প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে বাংলার একমাত্র ইংরাজী সান্ধ্য পত্রিকা

THE FREE-LANCE

বলেন—

....In the book uuder review the author has sought to explain the cardinal tenets of the Geeta in the light of his vast scholarship sublimated by his spirituai experience. A man with deep and extensive knowledge, both of Eastern and Western philosophies the writer has earned international reputation for his learned discourses on religious topics. 'Geeta Dhyan' bears the unmistakable stamp of a mind enlightened not only by academic wisdom but suprasensuous experience. From this point of view, the book has got a distinctiveness of its own. The style is characterised by lucidity and a conversational flavour. The originality of approach and charm of language will make the book attractive as much to the common reader as to those well-versed in scriptural literature.—**Tapan Bose** [Calcutta, Wedenesday, October 19, 1955,]

গৌর-কথা

[এক]

যুগসমস্যায় মহাপ্রভু

আজ হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে। আমাদেরই মধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন প্রেমঘন বিগ্রহ এক যুগের মানুষ। বাংলার কোলে ভাগীরথীর কূলে কীর্ত্তন-মাতোয়ারা নদীয়ায়, পূর্ণিমার সমুজ্জ্বল সন্ধ্যায় শ্রীশচী-জগন্নাথের আনন্দ-মুখর আঙ্গিনায়।

তাঁর রূপ ছিল অনবদ্য, গুণ ছিল অনুপম, মাধুর্য্য ছিল অনির্ব্বচনীয়। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই সেই যুগের মধ্যে এমন মানুষটি ছিল না। সমাজের সকল আত্মিক দৈন্য তিনি মুছাইয়া দিয়াছিলেন। সকল নীচতার বেদনা তিনি ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন। অনেক প্রকার সমস্যার কঠিনতা তিনি মিটাইয়া দিয়াছিলেন। বৈষম্য-ক্লিষ্ট সমাজের অগণিত নরনারীকে তিনি এক মহা-সাম্যনীতির ভূমিকায় উন্নীত করিয়াছিলেন। ডাকিয়া ডাকিয়া শান্তির সন্ধান দিয়া অশান্ত জীবনিবহকে তিনি ধন্য করিয়াছিলেন।

আজি আবার মানব-সমাজে যে মর্ম্মান্তিক যুগসমস্যার উদ্ভব হইয়াছে আমরা তাহার সমাধান খুঁজিব। আমরা সেজন্য সেই মহাযুগের দেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্মের দিকেই তাকাইব। সর্ব্বাগ্রে বুঝিব বর্ত্তমান যুগ কি, তার সমস্যা কি। তারপর বেদনার অন্ধকারে মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের করুণা-চন্দ্রিকাই আমাদের চলার পথের শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ পাথেয় হইবে।

বর্ত্তমান যুগ বলিতে প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক যুগই বুঝি। এই যুগে জড়-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। নানাবিধ গবেষণায় নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে ঐ সকল তথ্য বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রাদিতে রূপ পাইয়াছে। জড়ীয় সুখ লাভের উদ্দেশ্যে যন্ত্রাদির বহুল ব্যবহার হইতেছে। ফলে, সমাজে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলি জীবনের বহুক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতেছে। তন্মধ্যে দুইটি ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষের গমনাগমন (Transportation) এবং সংবাদের আদান প্রদান (Communication), এই দুই দিক্‌কার পরিবর্ত্তন চমকপ্রদ। পূর্ব্বে মানুষ ঘণ্টায় চারি মাইলের অধিক চলিতে পারিত না, বর্ত্তমানে আকাশযানে সাতশত মাইল পর্য্যন্ত চলিতে পারে। পূর্ব্বে মানুষ প্রাণপণ করিয়াও তিনশত হাতের অধিক দূরে কণ্ঠস্বর শুনাইতে পারিত না। বর্ত্তমানে রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে তিন হাজার মাইল দূরের গান ঘরে বসিয়া শুনিতেছে। বিজ্ঞানের প্রসাদে দূরের মানুষ নিকট

হইতেছে। দূর দূরান্তরের ঘটনা নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। পৃথিবীটা যেন আয়তনে ছোট হইয়া গিয়াছে। দূর দেশবাসী যেন নিকট প্রতিবেশীর মত হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান জড়-বিজ্ঞানের ইহা এক বিস্ময়কর দান। বৈজ্ঞানিক যুগ বলিতে এখন আমরা এই যুগই বুঝি।

কিন্তু এই বিরাট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞান দূরকে নিকট করিয়াছে ইহা যেমন সত্য, একই বিজ্ঞান নিকট-জনকে দূরতর করিয়াছে, ইহা ততোধিক মর্ম্মান্তিক সত্য। একই বিজ্ঞানের প্রসারতায় দুই বিভিন্নমুখী বিপরীত ফল ফলিয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। এই যুগে মানুষ প্রতিবেশীকে চিনে না। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এমন কি পিতা মাতার পর্য্যন্ত খবর রাখে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় ও ব্যবহারে বহুল পরিমাণে কৃত্রিমতার আবরণ থাকে। কি ব্যক্তিসমূহ, কি জাতিসমূহ, একের অন্তর অপরের কাছে কপটতার আবরণে আবৃত। অকপটভাবের আদান প্রদান এক প্রকার অতীত কালের কাহিনীতে পর্য্যবসান হইয়াছে। সকল কার্য্যে যন্ত্রের মধ্যস্থতায় মানুষ যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। কখন যে যন্ত্রে যন্ত্রে সংঘর্ষ বাধিয়া বারুদের ঘর উড়িয়া যায় এই ভয়ে সকলে ভীত ত্রস্ত ও শঙ্কিত হইয়া বসবাস করিতেছে।

যন্ত্র-সভ্যতা লোক-সংঘট্ট বাড়াইয়া দিয়াছে। মানুষ মানুষের গায়ে ঠেকিয়া চলিতেছে। মানুষের চাপে মানুষ নিষ্পিষ্ট

হইয়া মরিতেছে। চারিদিকে জন-সমুদ্র অথচ ইহারই মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ যেন অসহায় একাকী, নিজের ভারে নিজে আতুর। যে-বিজ্ঞান দূরকে নিকট করিয়াছে, সে-ই আপনাকে পর করিতেছে। লোক-সংঘট্ট বাড়িয়াছে, কিন্তু "লোক-সংগ্রহ" কার্য্যটি একেবারে যেন চির বিদায় লইয়াছে। লোকের গায়ে গায়ে ঠেকিতেছে, কিন্তু প্রাণে প্রাণে মিশিতেছে না। নিরন্তর ঠেলাঠেলি চলিতেছে কিন্তু একটিবারও গলাগলি করিতেছে না। মানুষ হাত পা চোখ কান বর্দ্ধিত করিবার বুদ্ধি ও যন্ত্র আয়ত্ত করিতেছে কিন্তু দীন সংকুচিত আত্মাকে বিশালতায় পৌঁছাইবার সাধনা ভুলিয়া গিয়াছে।

এই যুগে মানুষের দৈহিক ক্ষুধা বাড়িয়াছে, আত্মিক ক্ষুধা মরিয়া গিয়াছে। ভোগবিলাস-সম্ভার পুঞ্জীভূত হইয়া সহস্র সহস্র বিপণীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে কিন্তু আত্মার মহদ্‌গুণ সমূহ মৃতকল্প হইয়া মানব-সভ্যতাকে সাহারা মরুতে পরিণত করিতেছে—ইহাই বর্ত্তমান যুগসমস্যা। ইহাই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। এই বিরাট মানবীয় ব্যবধান দূর হইবে কিরূপে? অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ মানুষের অতি নিকট। ধর্ম্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়া মানুষ মানুষ হইতে দূর—অতি দূর। দেহ কাছে, প্রাণ দূরে। মানুষে মানুষে ঠেকাঠেকি প্রাণহীন যন্ত্রের ধাক্কাধাক্কির তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই অদ্ভুত অসামঞ্জস্যই সমাজে অশেষ প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। এই সামঞ্জস্যের সমাধান কোথায়, ইহাই এই যুগের মৌলিক

জিজ্ঞাসা। বুঝিয়া না বুঝিয়া মানুষ এই জিজ্ঞাসার উত্তরই খুঁজিতেছে। সহস্র সহস্র সভা দিনের পর দিন বসিতেছে, ভাঙ্গিতেছে। মূল প্রশ্নের জবাব আসে নাই। আমরা আজ পাঁচশত বৎসর পিছাইয়া এই জিজ্ঞাসার উত্তর অনুন্ধান করিব।

মুসলমান শাসনের শেষভাগ। দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আছে, তবে ধনৈশ্বর্য্যের অভাব নাই। শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য-শাস্ত্র-চর্চ্চা প্রচুর। নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র। তথায় শত শত চতুষ্পাঠি, সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী নানা দিক দেশ হইতে সমাগত হইয়া চুলচেরা ন্যায়ের বিচারসভা বসাইয়াছে। নব্যন্যায়ের শুষ্ক তর্কে গঙ্গাতট মুখর। কিন্তু এত থাকিতেও মানুষ নাই। মানুষে মানুষে মিলন নাই। বর্ণাশ্রমের দুর্ভেদ্য দেওয়াল, অস্পৃশ্যতার কঠোর গণ্ডী মানুষের মধ্যে বিপুল ব্যবধান গড়িয়া রাখিয়াছে। পণ্ডিত "ব্যাপ্তি লক্ষণ" বিচার জানে, কিন্তু অপরের প্রাণের বেদনা আপন জীবনের "একাধিকরণ্যে" অনুভব করিতে পারে না। মুখ ভরিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মন্ত্র আওড়ায়, কিন্তু কাহার স্পর্শে অপবিত্র হইয়া যাইবে এই ভয়ে শঙ্কিত চরণ বিক্ষেপে পথ চলে। বিচারে, ব্রহ্ম "একরসং" কিন্তু ব্যবহারে, সমাজ লক্ষধা বিভক্ত।

আজ সমাজের যে অবস্থা করিয়াছে জড় বিজ্ঞানের গবেষণা, সেই কালে তাহাই ঘটাইয়াছিল শুষ্ক জ্ঞানের ব্যর্থ বিচারৈষণা। জীবন ছিল রসহীন, সভায় ছিল রসের বিচার। শাস্ত্রে সম্পদ ছিল, হৃদয়ে দরদ ছিল না। পুঁথিতে ভাষ্যের অনুভাষ্য ছিল কিন্তু চিত্তে মানবীয় ঔদার্য্যটুকু ছিল না। আজ যেমন যান্ত্রিক

প্রাচুর্য্যের মধ্যে হৃদয়ের দারিদ্র্য, সেদিন ছিল পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আত্মিক দৈন্য। জাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া মিথিলার দরদী কবি ব্যথাভরা লেখনীতে লিখিয়াছিলেন—

কত বিদগধ জন, রস অনুমানই,
অনুভব কাহুক ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ, প্রাণ জুড়াইতে,
লাখে না মিলল এক॥

দেশভরা পণ্ডিতের মেলা—কিন্তু হায়! প্রাণ জুড়াইবার স্থান নাই। মানুষের অন্তরের ব্যথা বুঝে এমন মানুষ নাই। জাতির কবি চণ্ডীদাস বেদনাহত হইয়াই মর্ম্মান্তিক ভাবে কহিয়াছিলেন—

শুনরে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ বড়ো
তাহার উপরে নাই।

একজন প্রাণের মানুষের জন্য. একজন হৃদয় জুড়ান সুহৃদের জন্য গোটা জাতি যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। সকল মানুষের প্রাণ গুমরিয়া কাঁদিতেছিল একজন দরদী বন্ধুর জন্য। সমগ্র সমাজের ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া শ্রীহট্টিয়া কমলাক্ষ ঠাকুর নামক এক মহাজন প্রাণ উঘারিয়া প্রাণের দেবতাকে ডাকিত। কাঁদিয়া বলিত, “এস প্রভো! মরুময় সমাজে রসসিঞ্চন কর।” তাঁহার কাতর আহ্বানে প্রাণের মানুষ সত্য সত্যই ধূলায় নামিয়া আসিয়াছিল। ধূলার

মানুষ ঘনীভূত প্রেম-বস্তুকে মানব-মূর্ত্তিতে পাইয়া জীবন জুড়াইয়াছিল।

আজিও এই বর্ত্তমান যুগসমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে তাকাইতে হইবে সেই চারি শতাব্দী পূর্ব্বকার মহা-সমন্বয়ের মূর্ত্তিটির দিকে। তিনি আসিয়াছিলেন নদীয়ায় কিন্তু ছিলেন তিনি সারা বাংলার, সারা ভারতের, সর্ব্ব মানবের। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসকে বিক্রম করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, কোন যুগে কোথাও কেহ কি কখনও এমন একটি মানুষকে দেখিয়াছে—যাঁহাকে সেই যুগের আপামর সকলে নিজ প্রাণের জন জানিয়া ভাল বাসিয়াছে? রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পণ্ডিত মূর্খ, পুরুষ নারী, ছোট বড় এক কথায় সকলে এক সাম্য ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যাঁহার দেহের শীতল ছায়ায় চির স্নিগ্ধ হইয়াছে? যাঁহার মধ্যে সকলে আপনাকে দেখিয়াছে, আপনাকে দেখিয়া চিনিয়া পরকে আপনার করিয়া লইতে শিখিয়াছে?

"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ"

বর্ত্তমান যুগসমস্যার ঘোরান্ধকারে সেই নদীয়ার ঠাকুরের করে যে প্রেমের দেউটি, তাহার আলোতেই পথ দেখিতে হইবে। আজিকার মহাসমস্যার সমাধান পাইতে হইলে, নানা কোলাহলে চাপা-পড়া নদীয়ার বাণীই আবার কান পাতিয়া শুনিতে হইবে।

নদীয়ার বিশাল বাণী একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলা চলে। সেটি হইল—প্রেম। এই একটি বস্তুর অভাবে সবদিক শূন্য। ইষ্টকের উপর ইষ্টক সাজাইলেই যেমন সৌধ হয় না, তেমনি জড়ীয় যন্ত্র পিষিয়া ভোগ্য দ্রব্যের বিপুল সম্ভার উৎপাদন করিলেই মানবীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠে না। প্রত্যেকখানি ইষ্টকের সঙ্গে প্রত্যেকখানির সুদৃঢ় একত্ব স্থাপনের জন্য যেমন সিমেণ্ট বা সংযোজক মসল্লার প্রয়োজন, মানব হৃদয়ের সঙ্গে মানব হৃদয়ের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সেইরূপ প্রয়োজন প্রেমের। এই একটি বস্তুর অভাবে বর্ত্তমান যুগধুরন্ধরগণের সকল প্রকার শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থতার আঘাতে ধূল্যবলুণ্ঠিত।

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া ত্রিলোক শিক্ষাগুরু সনাতন পুরুষ শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবকে তাই সনাতনী বাণী শুনাইয়াছেন। শুনাইয়াছেন একটি নিগূঢ় সংবাদ—"প্রেম প্রয়োজন।" প্রেম ছাড়া মানব সভ্যতা একটা প্রহসন বিশেষ। বর্ত্তমান বিজ্ঞান মানব-সংস্কৃতিকে ঐরূপ প্রহসনে পরিণত করিতে উদ্যোগী আছেন। শিবহীন যজ্ঞ যেমন দক্ষযজ্ঞ, প্রেমহীন সভ্যতা তেমন সমরাতঙ্কগ্রস্ত উন্মাদাবাস। দক্ষতা মানুষের যতই থাকুক, শিব না আসিলে জীবনযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড পণ্ডশ্রম মাত্র। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যন্ত্রের উৎপাদন দক্ষতা অপরিসীম থাকিলেও প্রেমপ্রীতিহীন মানব-কৃষ্টি মরুভূমির ধূ ধূ বালুকার মুষ্টি মাত্র। প্রকৃত মানব-প্রেম আকস্মিক জন্মে না। সহস্র বাকবিতণ্ডা লক্ষ সভাসমিতি প্রতিষ্ঠানের মারফৎ উৎপন্ন হয় না। কোন বাহ্য আড়ম্বরে হৃদয় সরস করে না।

ক্ষুধার নিবৃত্তি যেমন আহার্য্য দ্বারা উদর পূর্ত্তির ফল, মানব-প্রেম সেইরূপ ঈশ্বরীয় প্রেমের অনিবার্য্য পরিপূর্ণতা। কোন কৃত্রিম উপায়েই মানবীয় একত্ব আসে না। অন্তরের দেবতার সঙ্গে আন্তর সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই জীবে জীবে প্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম জীবপ্রেম এক রেখার দুই প্রান্ত। এই দুই প্রান্তের অখণ্ড মিলনঘন মূর্ত্তিই মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। সুগভীর ভগবৎপ্রেম বিশ্বপ্লাবী মানব-প্রেম শ্রীগৌরাঙ্গের একাঙ্গে একীভূত। যুগসমস্যায় ধ্বস্তবিধ্বস্ত সমাজ যদি মহামিলনের আলোক চাহে তাহা হইলে ঐ নদীয়ার ঠাকুরটির চরণ-চন্দ্রেই পাইতে হইবে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রেমবিগ্রহ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তাঁহার ভক্তগণ সহ দুস্থ জগজ্জীবের দুয়ারে এই মহাবাণীই ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা যেন তাহা উপেক্ষা না করি। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, গৌরসুন্দরের করুণা কটাক্ষ লাভ করিয়া প্রেমধনে যে ধনী হইয়াছে তাহার কাছেই—

"বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে
বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে"

বিধিমহেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকেও তুচ্ছ করিয়া বিশ্বকে সুখময় করিয়া তুলিতে করুণা-সমুদ্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষই উন্মার্গগামী আমাদের পরম সম্বল হউক।

———

[দুই]

প্রেমধর্ম্ম ও মহাপ্রভু

এই ঘোর সংশয়ের যুগে যে-কথা লইয়াই কথা আরম্ভ করি না কেন সংশয় উঠিতে পারে। যদি বলি আত্মা আছে, যদি বলি ধর্ম্ম আছে, তাহা হইলে একদল সংশয়াত্মা আছে যারা বলিবে, ঐ সব বস্তু আছে কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে—এ বড় বিষম সমস্যা। কোনও না কোন বস্তু লইয়া কথা আরম্ভ করিতেই হইবে, অথচ যাহা লইয়াই সূচনা হইবে তৎসম্বন্ধেই সন্দেহের অবকাশ থাকিবে।

প্রাচীন আর্য্য-ঋষিরা তাই এমন একটা কথা লইয়া দার্শনিক কথার উপক্রমণিকা করিয়াছেন, যে সম্বন্ধে কাহারও সংশয়াবসর নাই। যে সম্বন্ধে কোথাও দ্বিমত নাই, যে-বিষয়ে সর্ব্বজন-স্বীকৃতি আছে, তাহার উপরে ভিত্তি স্থাপন করিলে প্রাসাদ সুদৃঢ় হইবারই কথা। সেই সর্ব্ববাদিসম্মত কথাটি হইল—"জীবনে দুঃখ আছে।"

জীবনের মধ্যে দুঃখ আছে—এই কথায় আপত্তি তুলিবার কোনও লোক নাই। যে শুনিবে একবাক্যে বলিবে যে "দুঃখ আছে" একথাটা ঠিকই। ইহার সঙ্গে আরও একটা কথা ঠিক যে, দুঃখ কেহই চায় না। অন্যকে করুক না করুক সকলেই প্রভাতে উঠিয়া নিজেকে নিজে আশীর্ব্বাদ করে "আমার যেন দুঃখ না আসে, সুখ যেন পাই।" সকলের এই মনের

তলার কথাটা শ্রুতিমন্ত্র বলিয়াছেন—"দুঃখং মে মাভূৎ সুখং মে ভূয়াৎ"—ইহা সকল জীবের অন্তরের লালসা "দুঃখ না হউক" এই সঙ্গেই "সুখ হউক" কথাটি আছে। কারণ, আমাদের জীবনে দুঃখই একটা সুখের সংবাদ বহিয়া আনে। দুঃখ যে মানুষ ভোগ করে—ইহার গূঢ় হেতু হইল যে, কোথাও না কোথাও সুখের সন্ধান আছে। যদি কোথাও সুখ না থাকিত ও সেই সুখ-সম্বন্ধে কোনও স্মৃতি বা কোন আশা না থাকিত তাহা হইলে নির্জ্জলা দুঃখ কেহই ভোগ করিত না। শ্রুতিও সেই কথা বলিয়াছেন—"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষঃ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—কে-ই বা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিত, কে-ই বা জীবন ধারণ করিত, যদি কোথাও আনন্দ বস্তু না থাকিত। আনন্দ তবে আছে।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন—দুঃখাদি আপেক্ষিক শব্দ। দুঃখানুভূতির মূলে আছে সুখস্মৃতি। তুলনাতেই দুঃখের বোধ। বড়লোকের সন্তান গরীব হইয়া গেলে যত দুঃখ বোধ করে. যে গরীব হইয়াই জন্মাইয়াছে সে সে-ই অবস্থায় তেমনটা কিছু অনুভব করে না। পূর্ব্বানুভূত সুখের স্মরণেই দুঃখের বোধটা জাগিয়া ওঠে। সে যে কত-বড়লোকের ছেলে তার মাপকাঠি হয় তার দুঃখের 'তীব্রতায়, বেদনার নির্ম্মমতায়।

আমাদের জীবনের দুঃখানুভূতিও সেইরূপ একটা বিপুল মহত্ত্বের সন্ধান আনিয়া দেয়। বড়ত্বের মধ্যে যে আমাদের জন্ম, ভূমাত্বের সঙ্গে যে আমাদের যুক্ততা আছে, দুঃখের অভিঘাত তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঋষিরা তাই কহিয়াছেন—"দুঃখ

ত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা।" তত্ত্ব জিজ্ঞাসা অন্তরে জাগে ত্রিবিধ দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে। আমরা যে বড়লোকের ছেলে ছিলাম, এখন নিঃস্ব হইয়াছি, এই স্বরূপ-ভ্রষ্টতার সংবাদ বহিয়া আনে দুঃখ নামক রাজদূত। তার বেদনার পতাকায় খেদের বার্ত্তা লেখা থাকে। ধনীর সন্তান ছিলাম, বাল্যে চর্ব্ব চোষ্য ভোগ করিয়াছি! এখন গরীব হইয়া পড়িয়াছি। শাক অন্ন মুখে রুচিকর হয় না। এই অরুচির মূল হেতু হইল বাল্যের চর্ব্ব চোষ্যের স্বাদ মনে মুখে লাগিয়া থাকা। এই আস্বাদন যদি রসনায় বা ভাবনায় কোথাও না থাকিত তাহা হইলে শাকান্নে অরুচি হইত না। আমাদের জীবনের যে পুঞ্জিত দুঃখ তাহা ইহাই জানাইতেছে যে, একটি আনন্দঘন বস্তুর স্পর্শসুখ এখনও আমাদের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত লাগিয়া আছে। লাগিয়াও আছে, হারাইয়াও ফেলিয়াছি। কথাটা আপাত বিরোধী—কিন্তু ইহাই সত্য।

ভিত্তি বাঁধিয়া, দেয়াল গাঁথিয়া, ছাদের আবরণ দিয়া লোক বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু শেষে ভিত্তির ভিতরেও থাকে না, দেয়ালের মধ্যেও থাকে না, ছাদের উপরেও থাকে না। দেয়াল ছাদ ভিত্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ আকাশেই বাস করে। থাকিবার স্থান আকাশ ছাড়া আর কোথাও নাই। একটা অখণ্ড আকাশ, আর একটি খণ্ড আকাশ। একটা ভূমা, আর একটি গণ্ডীবদ্ধ ভূমি।

বদ্ধ গৃহ যদি একেবারে রুদ্ধ হয়—দরজা জানালা মাত্রও না থাকে তাহা হইলে সেখানে বাঁচা যায় না। বদ্ধ গৃহ,

অন্ধকূপ তুল্য মৃত্যুর আগার। মুক্ত গৃহই বাসযোগ্য। বৃহত্তর আকাশ বাতাসের সঙ্গে যে-গৃহের যোগাযোগ যত অধিক, আলো বাতাসের প্রবেশের ফলে সেই গৃহ তত স্বাস্থ্যকর, তত অমৃতময়। শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন, "নাল্পে সুখমস্তি। যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখং। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য।" অল্পে সুখ নাই। খণ্ডে আনন্দ নাই। ভূমাই সুখের আকর। অখণ্ডের মধ্যেই আনন্দ। অতএব অখণ্ড আনন্দের সন্ধান লও। খাঁচায় বদ্ধ পাখী কেবল খাঁচার বেড়াটা কামড়ায়। কামড়াইতে কামড়াইতে শুধু কেবল "নাল্পে সুখমস্তি" এই বেদমন্ত্রটিই মানসে জপ করে।

বৃহত্তমের সঙ্গে যে যোগসম্বন্ধ, অখণ্ড ভূমানন্দের সঙ্গে যে ভাববন্ধন তাহারই নাম প্রেম। এই প্রেম শূন্য হইলে সংসার মরুভূমি হইয়া যায়, মানবজীবন অন্ধকূপে পরিণত হয়। লক্ষবিধ ভোগ সম্ভার ও আড়ম্বরের মধ্যে বাস করিয়াও যদি প্রাণ প্রেমহীন হয় তাহা হইলে জীবনধারণ দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে, যা কিছু লৌকিক শোভা সৌন্দর্য্য দুঃখের দাবদাহনে জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। দরজা জানালা শূন্য বদ্ধ-দেয়াল গৃহ যদি রত্ন মাণিক্যপূর্ণও হয় তথাপি যেমন তাহা বিড়ম্বনা মাত্র, অশেষ ভোগৈশ্বর্য্যে ভরা সমাজ রাষ্ট্র যদি প্রেমসম্বন্ধ হীন হয় তাহাও তদ্রূপ নিরর্থক আবর্জ্জনা তুল্য।

প্রেমই প্রকৃত ধর্ম্ম। জগতে বহুবিধ ধর্ম্ম আছে তন্মধ্যে প্রেম-ধর্ম্ম একটি ধর্ম্ম—এই অর্থে আমরা প্রেম-ধর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করি না। প্রেমই ধর্ম্ম, এই অর্থেই প্রেম-ধর্ম্ম কথা সার্থক। প্রেম ছাড়া কোন ধর্ম্ম নাই। অ-প্রেমের ভিত্তিতে সংসারের

কোন ধর্ম্ম গড়িয়া উঠে নাই। কেবল তাহাই নহে, কোন ব্যষ্টিজীবন বা সমষ্টিজীবন প্রেম ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না। যদি দেখা যায় দাঁড়াইয়া আছে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিতে হইবে কর্পূরের মত তাহা উবিয়া যাইবে। যে ধরিয়া রাখে সে-ই ধর্ম্ম। প্রেমই ধরিয়া রাখে। অতএব প্রেমই ধর্ম্ম। প্রেম শূন্যতাই অধর্ম্ম।

সংসারে যত বস্তুর প্রয়োজন, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন প্রেমবস্তুর। ইহা জীবনের সকল প্রয়োজনের চরম প্রয়োজন। এই সর্ব্বাতিশায়ী প্রয়োজনীয় প্রেম সম্পদ যিনি দান করেন তিনি শ্রেষ্ঠ দাতা। যিনি অকাতরে সর্ব্বজনে দান করেন তিনি দাতা-শিরোমণি। এই প্রেমামৃতের আস্বাদন দিতে যিনি জীব-জগতের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া বেড়ান তাঁহার মত জীবের দরদী ব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয়টি নাই। ঐরূপ জীব-দরদী বদান্যশিরোমণি আমরা মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জড় মানবের জড় ইতিহাসের মধ্যে সেই চিন্ময় প্রেম-বিগ্রহ প্রকট হইয়াছিল। প্রেম যদি পরম প্রয়োজন হয়, প্রেম-বিগ্রহের কথাও চরম প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রেমের স্বরূপ কি এবং মহাপ্রভু কেমন করিয়া বদান্য-শিরোমণি, আমরা এই কথা ক্রমশঃ অনুশীলন করিব।

এই সংসারে আমরা পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, পতি পত্নী সঙ্গে নানাবিধ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ভালবাসায় আবদ্ধ আছি। এই ভালবাসার মধ্যে যেটুকু আনন্দরস আছে তাহা লইয়াই আমরা দুঃখময় সংসারের মধ্যে বাঁচিয়া থাকি। কাব্যে

সাহিত্যে শিল্পে ঐ ভালবাসাকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করি। লৌকিক জগতে ঐ ভালবাসাই 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়। যাঁহারা প্রেমতত্ত্ববিদ্ তাঁহারা পার্থিব এই ভালবাসাকে প্রেম বলিতে রাজী হন না। তাঁহারা ইহাকে প্রেমাভাস বলিতে চাহেন। জাগতিক আনন্দকে তাঁহারা আনন্দাভাস বলেন। লৌকিক সুখরসকে তাঁহারা রসাভাস শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেন।

এই সব আভাস মাত্র হইলেও ইহার মধ্য দিয়া বাস্তব বস্তুর অনেকখানি সন্ধান আমরা লাভ করি। ছায়ার মধ্যে যেমন কায়ার পরিচয় পাই, ছবির মধ্যে যেমন ব্যক্তির খবর পাই, মানচিত্রের মধ্যে যেমন ভৌগোলিক নগর জনপদ নদনদী পাহাড় পর্ব্বতের সংস্থান পরিজ্ঞাত হই, ঐ সব আভাসের মাধ্যমেও সেইরূপ প্রকৃত প্রেমের বা আনন্দ-রসের স্বরূপ অবগত হইতে পারি। কিরূপে তাহা বলিতেছি। তৎপূর্ব্বে ঐ সকল পার্থিব রসাদিকে আভাস বলা হয় কেন, তাহাই বলা প্রয়োজন।

পার্থিব ভালবাসাকে প্রেমের আভাস বলা হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, উহা ধ্বংসশীল। প্রেম একপ্রকার ভাব-বন্ধন। ঐ বন্ধনের একটি বিশেষণ দেন পণ্ডিতেরা "ধ্বংস রাহিত্যং"। যে ভাব-বন্ধনে ধ্বংস নাই তাহাই প্রেম। সংসারে মাতা পুত্রকে ভালবাসে। অগণিত মাতা অগণিত পুত্রকে ভালবাসে। পশুপক্ষীর মাতাও সন্তানকে ভালবাসে। এই বাৎসল্যকে বাৎসল্যাভাস বলি। কেন না, এক সময় ঐ

মাতৃগণও মরিয়া যাইবে, ঐ সন্তানগণও মরিয়া যাইবে। মৃত্যুরূপ কারণ উপস্থিত হইলে ঐ বাৎসল্য আর থাকিবে না। বিনাশ-শীল বলিয়াই উহা আভাস।

তবে কি মৃত্যুঘেরা নশ্বর জগতে প্রেম নাই? নিশ্চয়ই নাই। কোথায় আছে? মৃত্যুহীন অমৃতময় শাশ্বত লোকে। ভৌম বস্তুতে প্রেম হয় না। যাহা ভূমা তাহাই প্রেমের বিষয়। যাহা প্রাকৃত তাহাতে প্রকৃত প্রেম নাই, প্রেমাভাস মাত্র। যাহা অপ্রাকৃত তাহাই প্রকৃত প্রেমের আশ্রয়, নির্ম্মল নির্দ্দোষ আনন্দ-রসের ভূমি।

লৌকিক মাতারও মৃত্যু হয়, সন্তানেরও মৃত্যু হয়। উভয়ের ভালবাসা বস্তুটি কোথায় যায়? ওটি আসে বা কোথা হইতে, চলিয়াই বা যায় কোথায়? থাকে যখন তখন থাকেই বা কি অবলম্বনে? প্রেমতত্ত্ববিদ্ ভাগবতীয়েরা ইহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, একজন নিত্যমাতা আর একজন নিত্যপুত্র আছেন। ঐ নিত্যমাতার ক্রোড়ে ঐ নিত্য-পুত্র নিত্যকাল বাৎসল্য-রস-সমুদ্রে ডুবিয়া স্তন্যপান করিতেছেন। সেই যে অফুরন্ত অনন্ত বাৎসল্য-রস-প্রবাহ, তাহাতেই জগতের অগণিত মাতা অগণিত সন্তান সঞ্জীবিত রহিয়াছে। অই যে নিত্য যশোদার কোলে নিত্যগোপাল বাৎসল্য রসাবিষ্ট— ওখান হইতেই সকল বাৎসল্য আসে, ওখানেই সকল বাৎসল্য মিশায়, ঐ মহা-সমুদ্রের উপরেই সকল বাৎসল্য বীচি, বুদ্‌বুদের মত হাসে ভাসে খেলে।

ঐ নিত্যমাতা নিত্যপুত্রের ক্রীড়াভূমিই ব্রজ। প্রত্যেকটি

রসের অখণ্ড বিলাস-ভূমির নাম ব্রজ। ব্রজই অমৃতময় শাশ্বত ভূমি, ভূমানন্দের নিত্য বিহারভূমি। ব্রজ-প্রেমের কোন হেতু নাই। হেতু নাই বলিয়াই নাশ নাই। ধ্বংসের কারণ থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস নাই। "সত্যপি ধ্বংসকারণে নিয়ত ধ্বংস-রাহিত্যং" এই প্রেমের লক্ষণ ব্রজেই পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত। ব্রজ-তত্ত্বটি কি এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি এবং কেমন করিয়াই বা তিনি এই ব্রজ-প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, তাহা ক্রমে আলোচ্য।

[তিন]

ব্রজতত্ত্ব ও মহাপ্রভু

"জীবন যুদ্ধ" কথাটার বর্ত্তমান যুগে খুব বাজার চল। কথাটা চালু করিয়াছেন পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডারুইন সাহেব। সংসারে টিকিয়া থাকিতে হইলেই নাকি ধস্তাধস্তি করিতে হইবে। "Struggle for Existence" বাঁচিতে হইলেই যুদ্ধ চাই। আর যুদ্ধে জিতিবে কে? Survival of the fittest. যার শক্তি বেশী সেই "ফিট"। "ফিট" যিনি, তিনিই টিকিবেন। এই ডারুইন-দর্শনের উপরে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা বিজ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্র দাঁড়াইয়া আছে।

সপ্তশতী চণ্ডী বলিয়াছেন—"দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।" একশত বৎসর ধরিয়া দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে।

২

একশত বৎসর একটি মানুষের পূর্ণ আয়ুষ্কাল। সঙ্কেতে যেন বলিতেছেন—সারা জীবন ভরিয়াই লড়াই চলিতেছে। দৈবী সম্পদ আর আসুরিক সম্পদের সংঘর্ষ জীবন ভরিয়া লাগিয়াই আছে। এই যুদ্ধ কোন ক্ষেত্র-বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। সর্ব্বত্রই সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ। পথে যে হাঁটিয়া চলি সেও যুদ্ধ—কখন অপরের চাপে পড়িয়া মরি, সেই ভয়। শ্বাস-প্রশ্বাস যে করি সেও যুদ্ধ—সর্ব্বদা আশঙ্কা কখন কোন্ ফাঁকে ব্যাকটেরিয়া ব্যাসিলি ঢুকিয়া পড়ে।

ভাবুক-চিত্তে জিজ্ঞাসা জাগে—ডারুইনই কি শেষ কথা কহিয়াছেন? যুদ্ধই কি বিশ্বজগতের চরম সংবাদ? ভারতীয় ঋষিরা কিন্তু এই কথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা এই যুদ্ধের মধ্যে বসিয়াই মন্ত্র পাঠ করিয়াছেন—"মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" কেমন করিয়া তাঁহারা এই রণাঙ্গনের আড়ালে যে মধুপ্রবাহ তাহা জানিতে পারিলেন, কোন্ দিব্য-দৃষ্টিবলে তাঁহারা এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধটাকে তুচ্ছ করিয়া "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"—ধূলিকণায় পর্য্যন্ত মধুমাধুরী দর্শন করিলেন, ইহা এক আশ্চর্য্য খবর। ইহা ডারুইনকে তথা বর্ত্তমান যুগকে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে।

ঐ চ্যালেঞ্জের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যুদ্ধটা কিসের জন্য? যুদ্ধেই কি যুদ্ধের সার্থকতা? যদি যুদ্ধই যুদ্ধের শেষ কথা হইত, তাহা হইলে যুদ্ধোন্মত্ত জাতিরাও war to end war—যুদ্ধকে জগৎ হইতে চির বিদায় দিবার জন্য এই যুদ্ধ করিতেছি—এই রব তুলিয়া যুদ্ধকে সমর্থন করেন কেন?

যুদ্ধ করিবার জন্যই যুদ্ধ করিতেছি একথা জগতের মানুষ শুনিতে চায় না। কোনও যোদ্ধার মনও ঐ কথা মানিয়া যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী হয় না। যুদ্ধের ফলে কোথাও শান্তি হইবে, এমত আশা আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকিত তবে কেহই যুদ্ধ করিত না। যুদ্ধ জয়ে কোন প্রিয়জন বা কোন প্রিয় রাজ্য বা কোন প্রিয় আদর্শবাদ জয়ী হইয়া নিষ্কণ্টকে নিরালা শান্তিপূর্ণ আনন্দময় অবস্থায় কুশলে দীর্ঘজীবী হইবে—এই মত ধ্যান অন্তরের তলে না থাকিলে যুদ্ধরত ব্যক্তিরা বিমুখ হইয়া গৃহে পলায়ন করে, যুদ্ধ অচল হইয়া পড়ে।

সুতরাং যুদ্ধ একটা যুদ্ধবিহীন অবস্থার সংকেত করে। দ্বন্দ্ব একটা দ্বন্দ্বাতীত রাজ্যের খবর আনে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে ব্রজের বাঁশরীর রেশ চলিয়া আসে। গীতা, ভাগবতের বার্ত্তা বহিয়া আনে। জীবন রক্ষার জন্য ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটা মানুষ আঠার ঘণ্টাও খাটিতে পারে। পারে কেবল একটি আশায়—বাকী সময়টুকু প্রিয়জন লইয়া সুখে কাটাইতে পারিব। যদি চব্বিশ ঘণ্টাই খাটিতে হইত, কোথাও আনন্দ পাইবার একটু স্থান কাল না থাকিত, তাহা হইলে কেহই খাটুনী খাটিত না। দিবসের কর্ম্মশালার ক্লান্তি, এমন একটি স্থানের জন্য লালসা জাগায় যেখানে অফুরন্ত শান্তি। যেখানে কর্ম্মের চাপ নাই, দায়িত্বের বোঝা নাই, বিদ্যার গৌরব নাই, ঘড়ির কাঁটার হিসাব নাই। যেখানে আছে শুধু মলয় পবন, প্রিয়ের আবাহন, প্রীতির ছন্দঃ, প্রেমের সঙ্গীত। কালের গতি যেথায় স্তব্ধ প্রায়। মনের তলায়

মানুষ ইহাই চায়। জীবনের কুরুক্ষেত্রই কালিন্দীকূলের ধীর-সমীরের জন্য আকুল আগ্রহ জাগায়।

ডারুইন কর্ম্মশালাটা দেখিয়াছেন, কিন্তু গভীর ভাবে তলাইয়া দেখেন নাই। প্রত্যেক মানবই কর্ম্ম করে, কিন্তু কেবলই যে ছুটি চায় তাহা লক্ষ্য করেন নাই, কর্ম্ম-কোলাহল হইতে রসের ভূমিতে যাইবার জন্য সকলেই অবসর খোঁজে। রস-ভূমি হইতে কিন্তু কেহ ছুটি চায় না। নিত্য চিরকাল ঐখানেই আনন্দে করিয়া থাকিতে চায়। কর্ম্মশালায় কর্ম্মী কেবল প্রতিনিয়ত কর্ম্ম বিরতি কামনা করে। রস-ভূমির প্রীতির আরতিও কর্ম্ম, কিন্তু তাহাকে কেহ কার্য্য মনে করে না। বিরতি হউক এমন লালসা করে না।

মানবের জীবনের দুইটি ভূমি একটি কর্ম্মের ভূমি, একটি রসের ভূমি। ইহার নিগূঢ় হেতু হইল এই যে, পুরুষোত্তমের লীলা-জীবনেরও দুইটি ভূমি আছে—একটি কুরুক্ষেত্র, অপরটি বৃন্দাবন। যারা কুরুক্ষেত্রকে বড় করিয়া দেখে তারাই বলে জীবনটা সংগ্রামময়, কেবলই যুদ্ধ। ধস্তাধস্তি ঠেলাঠেলি করিয়াই বাঁচিতে হইবে। আর যারা বৃন্দাবনকে বড় করিয়া দেখে, যারা জানে রসভূমিতেই সংগ্রামের সার্থকতা, তারা "মধুবাতা ঋতায়তে" মন্ত্রের আস্বাদক, তারা রস-ব্রহ্ম, মধু-ব্রহ্ম, আনন্দ-ব্রহ্মের সংবাদ প্রাণ ভরিয়া গান করে। বিশ্ব মধুময় দেখে।

ডারুইন, স্পেনসার ও তাঁদের শিষ্যবর্গ যুদ্ধটা ভাল করিয়াই দেখিয়াছেন কিন্তু যুদ্ধের গানটায় কান দেন নাই। যুদ্ধের গান শুনিয়া, আমাদিগকে শুনাইয়াছেন দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

যুদ্ধের গানটি গীতায় প্রকটিত। "মামনুস্মর যুধ্য চ" ইহাই গানের ধ্রুবপদ। "যুদ্ধ কর—কিন্তু আমাকে স্মরণ করিতে করিতে কর।" যুদ্ধবাদীরা যদি ঐ গানটা শুনিত, তাহা হইলে পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া যাইত। গীতার গান শুনিতে শুনিতে ব্রজের বাঁশীর রেশ কানে আসিত।

বৃন্দাবনের পরম সংবাদ শুককণ্ঠে ভাগবতে উচ্চারিত হইয়াছে। সেখানে সবই স্বচ্ছন্দতা পূর্ণ, সবই ছন্দোময়। কথা নাই, কেবল গান। চলা নাই, কেবল নৃত্য। কর্ম্ম নাই, কেবল আত্মদান। গীতার উপদেশ কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগে পর্য্যবসান, ভাগবতের বাণী ঐ তিনের মিলনময় নবায়মান নব-ছন্দে পর্য্যাপ্ত। ঐ একই ছন্দঃ বিশ্ব-প্রকৃতিতে ব্যক্ত, শোভাময় কুঞ্জকাননে। জীবন প্রকৃতিতে ব্যক্ত, প্রেমময় আত্ম-সমর্পণে। নিত্য ব্যবহারে ব্যক্ত, নৃত্যে গীতে সঙ্গীতের আলাপনে।

জীবন-যুদ্ধের সার্থকতা স্নেহের মিলনে। গীতার বাণীর চরিতার্থতা মুরলীর মূর্চ্ছনায়। স্নেহের রাজ্য আছে বলিয়াই কর্ম্মক্ষেত্র আছে। সৃষ্টি-সংসারের এই কর্ম্মশালা ব্যর্থ নয়, অর্থপূর্ণ একমাত্র ব্রজের জন্যই। কুসুমে যাহা হাসিরূপে গলিত, পিক-কণ্ঠে যাহা সুররূপে ঝঙ্কৃত, মানব হৃদয়ে তাহাই স্নেহধারারূপে প্রবাহিত। এই প্রবাহের মূল উৎস মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বিরাজিত। সেই কেন্দ্র-ভূমিই ব্রজ।

বিশ্বকেন্দ্রের স্নেহ-রসের ভূমিই ব্রজ। এই ব্রজতত্ত্ব নিত্য শাশ্বত। ইহা অনন্তকালই আছে। আছেই আছে, কোনও সংশয় নাই। মাতা পুত্রকে স্নেহ করেন একথা যদি স্বীকার

করি তাহা হইলে এক শাশ্বত মাতা যশোদা এক শাশ্বত পুত্র গোপালকে নিত্যকাল স্নেহের অঙ্কে তুলিয়া আদর করিতেছেন—এই সত্য স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। সংসারের স্নেহ প্রীতি যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার শাশ্বত ভিত্তি আছেই আছে।

যদি কেহ বলেন সংসারের স্নেহ প্রীতি মিথ্যা, মায়ার ছায়া মাত্র, তাহা হইলেও কিন্তু ব্রজের প্রীতি-রসের ভূমি মানিতেই হয়। কেননা সত্য দাঁড়াইতে যেমন সত্য ভূমিকার প্রয়োজন, মিথ্যা দাঁড়াইতেও সেইরূপ সত্য ভূমির প্রয়োজন। সর্পজ্ঞান যদি সত্য হয় তাহা হইলে সর্প আছেই। সর্প জ্ঞান যদি ভ্রান্তি হয় তাহা হইলেও রজ্জু আছেই। রজ্জুরূপ সত্য অধিষ্ঠানে না থাকিলে সর্পভ্রান্তি কুত্রাপি সম্ভব নহে। রজ্জু কেবল থাকিলেই হইবে না, সর্পের সঙ্গে তাহার কিছু সাদৃশ্যও থাকা চাই। তদ্রূপ মিথ্যা জগতের মিথ্যা স্নেহাপ্রীতিও একটি শাশ্বতী অধিষ্ঠান ভূমির অপেক্ষা করে। সেই অধিষ্ঠানই ব্রজ।

ব্রজের প্রীতি-ভূমির সঙ্গে জগতের প্রীতি-ভূমির কিছু সাদৃশ্য আছেই। পৃথিবীর সঙ্গে যেমন কমলালেবুর সাদৃশ্য। উভয়েই গোলাকার, উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। জগতের প্রীতি ও ব্রজের প্রীতি উভয়েই আকর্ষণ ধর্ম্মী, উভয়ই মিলন-বিরহময়। কিন্তু কমলালেবু অতি ক্ষুদ্র, পাঁচ দিনে পচিয়া যায়। পৃথিবী অতি বৃহৎ পাঁচশো কোটি বৎসর স্থিত আছে। তদ্রূপ জাগতিক প্রীতি স্বার্থভরা, বিনাশশীল পাঞ্চভৌতিক দেহনাশে নাশ হয়।

আর ব্রজের প্রীতি অতি মহান, স্বার্থ-গন্ধহীন, চির-অমৃতময়, নিত্য অমরণ ধর্ম্মী।

অনিত্য জগতের জীব নিত্য নিরন্তর ব্রজকে অনুসন্ধান করে। সকলেই করে, সর্ব্বদাই করে নিজ অজ্ঞাতসারেও করে। প্রত্যেক মানুষই ইচ্ছা করে যে, তাহার প্রিয়জনের স্নেহ প্রীতিতে কোন দোষ না থাকে, আত্মসুখ কামনা না থাকে। ইহা কদাপি সর্ব্বতোভাবে হয় না; তবু কিন্তু লোক কামনা করে। যতটুকু হয় ততটুকু শান্তি মানুষ লাভ করে। সকলেই ইচ্ছা করে যে, তাহার প্রিয়জন যেন মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। প্রিয়জন বাঁচিবে না, ভাবিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। প্রিয়জন জরা ব্যাধি মৃত্যু মরধর্ম্মী না হউক, অমর হউক, অমৃতময় হউক, ইহা সকলের প্রাণই চায়। ইহা কখনও হয় না। তবুও যতটুকু হয় অর্থাৎ প্রিয়জন যত রোগহীন হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করে ততই শান্তি হয়।

কেহই নিজ প্রিয়জনকে অসুন্দর দেখে না। যে-টুকু অসুন্দর থাকে সাজসজ্জা অলঙ্কারে সে-টুকু ঢাকিয়া দিতে চায়। ইহার কারণ এই যে, জীবের হৃদয়ের ভালবাসা অনিত্য ও অসুন্দর বস্তুকে ভালবাসিতে রাজী নয়। ভালবাসার আকূতি চির-সুন্দরকে পাইতে। অমৃতময় চিরসুন্দরকেই জীব প্রতিনিয়ত অনুসন্ধান করে। আমরা যখন অনিত্য ও অসুন্দরকে ভালবাসি, তখন আমরা ভালবাসাকে ফাঁকি দিয়া ঐ কার্য্য করাইয়া লই। মাতা যদি তার সন্তানকে সুন্দর না দেখিত ও "কখনও মরিবে না" এমন না ভাবিত, তাহা হইলে

ভালবাসিতে পারিত না। এই সন্তানই অমৃতময় চিরসুন্দর এই ফাঁকা কথা দিয়া হৃদয়ের ভালবাসাকে না ভুলাইলে সে তাহাকে আপন করিয়া লইতে রাজী হইত না। সেই সন্তান যখন মরিয়া যায়, ভালবাসা তখন বিদ্রোহ করে—বলে, আর কাহাকেও ভালবাসিব না। একে বলে শ্মশান বৈরাগ্য। এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না। আমরা আবার ভালবাসাকে ফাঁকি দিতে সুরু করি।

হৃদয়ের স্নেহ প্রীতি সেই পরমামৃতময় চিরসুন্দরকেই অনুসন্ধান করে। যতটুকু তাঁর কাছে অগ্রসর হইতে পারে ততটুকুই আনন্দ ভোগ করে। তাঁহা হইতে যতখানি দূরে সরিয়া যায় ততখানিই বেদনার আঘাতে জর্জ্জরিত হয়। মানব তাহার জীবনে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে যতখানি ব্রজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে ততখানি শান্তি সে প্রাপ্ত হয় ও প্রদান করে। যতখানি ব্রজ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ততখানি দুর্দ্দৈব বেদনাহত হয় ও অপরকে করে।

অতএব জীবের বেদনা ঘুচাইতে হইলে তাহাকে ব্রজমুখী করিতে হইবে। জীবকে চিরশান্তির অধিকারী করিতে হইলে তাহাকে নিত্য ব্রজের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দিতে হইবে। মানবজাতির শান্তি কামনায় যত সাধু মহাপুরুষ অবতার পুরুষ চেষ্টা করিয়াছেন সকলেই জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে অনিত্য জীব-জগতের সঙ্গে ব্রজের ব্যবধান দূর করিবার সাধনা করিয়াছেন। জীব ও ব্রজের নৈকট্য যিনি যতখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন তিনি ততখানি কল্যাণ

করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা ব্রজের আস্বাদনে ও বিতরণে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। যিনি যতখানি পূর্ণাঙ্গভাবে ব্রজতত্ত্ব আস্বাদন ও ব্রজভাব বিতরণ করিয়াছেন তিনি ততখানি মহান তত বিরাট বিভু ততখানি বড় মহা-মহাপ্রভু।

এ পর্যন্ত যত সাধু সজ্জন মহদ্ব্যক্তি অবতার পুরুষ জীব জগৎকে ব্রজের কাছে আনিয়াছেন তন্মধ্যে সকলের শীর্ষস্থানে বিরাজমান শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। সর্ব্বাঙ্গীণ ও পূর্ণাঙ্গীণ ভাবে ব্রজকে সর্ব্বাধিক জীবের গোচরীভূত করিয়াছেন মহাপ্রভুই। কেবল গোচরীভূত নহে অনুভব ও আস্বাদনের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। ইহা করিয়াছেন লেখনী বা বাণীর মাধ্যমেই নহে, আপনার নিরুপম জীবন-ছন্দে ব্রজের সমগ্র মূর্ত্তিখানি ফুটাইয়া তুলিয়া সকলের সম্মুখে ধরিয়াছেন। মানুষকে ব্রজের নিকটে লইয়া যাইবার চেষ্টা অনেকে করিতে পারেন কিন্তু ব্রজকে মানুষের দুয়ারে লইয়া আসিয়া যাচিয়া দিতে আর দ্বিতীয়টি নাই। গৌরহরি ব্রজের গূঢ়ধন আপনার মধ্যে প্রকট করিয়াছেন নিভৃত নিকুঞ্জের নিগূঢ় বার্ত্তা নদীয়ার মুক্ত আকাশতলে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ব্রজের সম্পদকে কেমন করিয়া আপন করিয়া পাইতে হয়, পাইয়া কেমন করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভোগ আস্বাদন করিতে হয়, তাহা অতি সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বাতিশায়িরূপে প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। ব্রজভাবের চরম প্রাপ্তির পরম ভূমিকার নাম সাধ্যতত্ত্ব। সেখানে পৌঁছিবার পথের পাথেয় সংগ্রহের প্রচেষ্টার নাম সাধনতত্ত্ব। এইবারে আমরা মহাপ্রভুর

দেওয়া সাধনতত্ত্ব ও পরে সাধ্যতত্ত্ব আলোচনা করিব। ক্রমে কৃপা হইলে উপসংহারে আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিব যে শ্রী সাধ্যসাধনতত্ত্ব দাতাশিরোমণির লীলা-জীবনের মধ্যেই পূর্ণভাবে প্রকটিত ও পর্য্যাপ্ত।

———

[চার]

সাধনতত্ত্ব ও মহাপ্রভু

মানুষের প্রয়োজন ফুরায় না। সততই কিছু না কিছু অনুসন্ধানে সে রত আছে। চাহিদা মিটে না। জীবের অপূর্ণতাই ইহার কারণ। অপূর্ণ জীব পূর্ণ হইতে চায়। অতৃপ্ত জীব তৃপ্তি খোঁজে। মরণশীল জীব অমৃতের দিকে প্রধাবিত হয়। যাবৎ না তার অমৃতময় ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, তাবৎ কামনার নিবৃত্তি নাই।

জীবনের সাময়িক প্রয়োজনগুলি আমরা খুব বুঝি। গোটা জীবনের প্রয়োজনটা বুঝি না, ভাবি না। কর্ম্মের প্রয়োজন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন জীবন-ধারণের জন্য ইহা স্পষ্ট। কিন্তু জীবনধারণ কিসের জন্য ইহা অস্পষ্ট। আমাদের কব্জীতে ঘড়ি বাঁধা দুই দশ মিনেটের হিসাব রাখি। কিন্তু সমগ্র জীবনটা যে চলিয়া গেল তাহার খতিয়ান নাই।

এই সমগ্র জীবনের প্রয়োজনটার নামই বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রয়োজন-তত্ত্ব। জীবনের যেটি চরম পরম প্রয়োজনীয় বস্তু সেটি কি? শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামিপাদকে এই প্রশ্নের উত্তর কহিয়াছেন—"পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।" যে প্রয়োজন মিটিলে সকল প্রয়োজনের নিবৃত্তি ঘটে তাহা হইল প্রেম। "প্রেম প্রয়োজন।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজন, এমন কথাও বলেন নাই। কারণ এই যে ভগবানকে পাইলেও পাওয়া হয় না, হৃদয়ে যদি প্রেম না থাকে। কংস শিশুপাল প্রভৃতিও কৃষ্ণকে পাইয়াছে, কিন্তু প্রাণ প্রেমহীন বলিয়া আস্বাদন হয় নাই। খাদ্য আছে ক্ষুধা নাই; ভোগ হইবে না। সুতরাং আগে প্রয়োজন ক্ষুধার। কৃষ্ণ আস্বাদনের ক্ষুধাই প্রেম। প্রশ্ন উঠিতে পারে, খাদ্য আছে ক্ষুধা নাই, এ যেমন কষ্টদায়ক অবস্থা, ক্ষুধা আছে খাদ্য নাই, ইহা কি তদপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর নহে? এই বিচারটা লৌকিক জগতের খাদ্য-ক্ষুধা সম্বন্ধে একান্ত ভাবেই সত্য, কিন্তু অলৌকিক অপ্রাকৃত ক্ষুধা "প্রেম" সম্বন্ধেই একেবারেই সত্য নহে। প্রেম নাই কৃষ্ণ আছেন এমন দৃষ্টান্ত আছে, যেমন কংসাদি। কিন্তু প্রেম আছে, কৃষ্ণ আসেন নাই এমত দৃষ্টান্ত কোথাও নাই। শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব প্রেমের এক অনির্ব্বচনীয় স্বভাব। প্রেমরূপ ক্ষুধা হৃদয়ে জাগিলে আস্বাদ্য বস্তু প্রেমের বিগ্রহ সেখানে ছুটিয়া আসিতে বাধ্য। এমনভাবেই তিনি প্রেমের অধীন।

এই পরম প্রয়োজনীয় বস্তুটি পাইবার উপায়ের নাম সাধন। প্রেমধন প্রাপ্তির সাধনের নাম ভক্তি। "ভক্তি প্রাপ্তির সাধন" ভক্তি বস্তু বড় দুর্লভ। শ্রীরূপের শিক্ষায় মহাপ্রভু ভক্তির সুদুর্লভতা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত জীব চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণশীল। স্থলচর জলচর গগনচর অসংখ্যেয় জীবনিবহ মধ্যে মানুষের সংখ্যা অতি অল্প। তন্মধ্যে শাশ্বত বৈদিক সিদ্ধান্তের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে এরূপ মানবের সংখ্যা আরও অল্পতর। যারা বেদ মানে তার মধ্যে অর্দ্ধেক লোক মুখে মাত্র বেদ মানে। জীবনের আচরণে বৈদিক সত্যের প্রকাশ নাই।

বৈদিক ধারা অক্ষুণ্ণ আছে যাহাদের জীবনের আচরণে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক যাগযজ্ঞ-ক্রিয়া-কর্ম্মান্বিত। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে সকলে অনুভূতি সম্পন্ন নহে। তত্ত্বের অনুভূতি ছাড়া মুক্তি হয় না। জ্ঞান-সম্পন্ন কোটি ব্যক্তির মধ্যে একজন অনুভূতি লাভ করতঃ মুক্ত হইয়া থাকেন। ঐরূপ কোটি মুক্ত মধ্যেও একজন কৃষ্ণভক্ত সুদুর্লভ। পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ স্থল।

মুক্তি কথাটা অভাববাচী, ভক্তি কথাটা ভাববাচী। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ বন্ধন হইতে অব্যাহতি হইল মুক্তি। ভক্তি কিন্তু একটা ভাববাচী বস্তুর আস্বাদন। যেমন পরাধীনতার বন্ধন-মুক্তি ও স্বাধীনতার উপভোগ এক বস্তু নহে। কখনও কোন দেশ বহু চেষ্টায় পরাধীনতার নাগপাশ ছেদন করে কিন্তু তৎসঙ্গেই স্বাধীনতার পূর্ণ ভোগ লাভ করে না। স্বাধীনতার

আস্বাদন একটা ভাববাচী বস্তুর সম্ভোগ উহা একান্তভাবেই চেষ্টা সাপেক্ষ। সেইরূপ মুক্তির সাধনা এক ভক্তির সাধনা অন্য। দৃষ্টি ভিন্ন, দৃশ্যও ভিন্ন।

"কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।" এইরূপ হইবার কারণ এই যে, মুক্তি-সুখের মধ্যে একটা আপাতপূর্ণ তৃপ্তির আভাস আছে। উহাতে যিনি মুগ্ধ হন তাহার ভক্তি-সাধনার পথই রুদ্ধ হইয়া থাকে।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা হৈনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

ভক্ত নিষ্কাম। মুক্তিকামও কামী। কামনাহীন বলিয়াই ভক্ত শান্ত। শান্ত বলিয়াই ভক্তির অধিকারী। ভক্তির দুর্লভতার কথা বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীরূপকে কহিয়াছেন সংসার চক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্বচিৎ কোনও ভাগ্যবান জীব ভক্তিলতার বীজ লাভ করে। কে সেই ভাগ্যবান? সংসার পথে চলিতে চলিতে কদাচিৎ কাহার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হয় যে, আমার অপর্য্যাপ্ত ধন জন বিদ্যা-বুদ্ধি সামর্থ্য সৌন্দর্য্য থাকিলেও আমি নিতান্ত হতভাগ্য, যেহেতু আমার হরিভক্তি হইল না। এই ভাবনা তীব্র হইয়া যদি চিত্তে উদ্বেগের সৃষ্টি করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান হয়।

ঐরূপ ভাবনাও যে বিনা-হেতু উদিত হয়, তাহা নহে। যে গৃহ-মেধীর প্রতিবেশীরা তদপেক্ষা দরিদ্র সে নিজেকে ধনী মনে করে। পক্ষান্তরে যাহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তদপেক্ষা অর্থশালী সে নিজেকে দরিদ্র বলিয়া ভাবে। তদ্রূপ ভক্তিধনে

যাহারা ধনী তাহাদের সঙ্গ সান্নিধ্য হইলে নিজেতে ঐ ধনের অভাব হেতু বেদনার উদয় হয়। পরন্তু অভক্তের সঙ্গ সান্নিধ্যে হৃদয়ে ভক্তি থাকিলেও তাহা নষ্ট হইয়া যায়। "লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়" কথাটা অতিশয়োক্তি নহে।

ভক্তিমান সজ্জনের সঙ্গবশতঃ যাহার হৃদয়ে ভক্তি বাসনা জাগিয়াছে সে-ই ভাগ্যবান। তাদৃশ ভাগ্যবান জন "গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥" "প্রসাদে পায়" শ্রীমুখোক্ত এই কথাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভক্তিবীজ চেষ্টা করিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র কৃপাতেই পাওয়া যায়। ইহা সর্ব্বতোভাবেই প্রসাদ-লভ্য। কদাপি প্রয়াস-সাধ্য নহে। তবে কি প্রয়াসের কোন সার্থকতাই নাই? আছে অবশ্যই। না থাকিলে এত সাধন ভজন জপ তপ করিতে বলা হইবে কেন?

বহু কষ্টকর প্রয়াস বা ভজন সাধনের ফলে জানা যাইবে যে তিনি প্রচেষ্টা-লভ্য বস্তুই নহেন। চেষ্টা আপন ব্যর্থতা জানাইয়া দিয়া—অন্তরে অনুভব করাইয়া দিয়াই সার্থক হয়। প্রকৃত অনুভূতি লাভ কৃপাতেই হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রেও আছে—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" যাহাকে কৃপা করিয়া বরণ করিয়াছেন সে-ই তাঁহার সন্ধান জানে। অন্য সকলের অন্য সকল প্রকার আয়োজনই আড়ম্বর মাত্র। অনুগ্রহ-শক্তির মূর্ত্তি শ্রীগুরু কৃপা ছাড়া আর পন্থান্তর নাই।

ভক্তি-বীজ হৃদয়ে উপ্ত হইলে নিত্য জল সেক দ্বারা উহার বর্দ্ধন সাধন করিতে হইবে। বর্দ্ধিত হইলে উহা ব্রহ্মলোক

পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ চরণ কল্পতরুতে আরোহণ করিবে। তখন লতায় প্রেমফল ফলিবে। জল সেক কিন্তু চলিতেই থাকিবে যেমন বীজের গায়ে, তেমনই ফলবতী লতার গায়ে। শ্রবণ কীর্ত্তন হইল এই জল সেক। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। অন্য সকল প্রকার সাধন অপেক্ষা মহাপ্রভুর দান এই ভাগবতীয় সাধনে একটা অপূর্ব্বতা আছে। অন্যান্য সকল সাধনে প্রথমে শাস্ত্রোক্ত সাধন রহস্য আচার্য্যমুখ হইতে শ্রবণীয় তৎপর জীবনের আচরণ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতিপালনীয়। কিন্তু উপরোক্ত ভাগবতীয় সাধনে মাত্র শ্রবণ দ্বারাই ফল প্রাপ্তি। শুধু শ্রবণাঙ্গের মাধ্যমেই প্রেমপ্রাপ্তি রূপ ফল লাভ। ইহা এক অভিনব কথা। মাত্র কথা শ্রবণেই মঙ্গল হইবে কিরূপে? এই শ্রবণমঙ্গলত্ব একমাত্র ভাগবত শাস্ত্রেতেই রহিয়াছে। ইহার গূঢ় হেতুটি অনুসন্ধেয়।

সকল শাস্ত্রে আছে "ইতি কর্ত্তব্যতা"—ইহা করিবে ইহা করিবে না এই বিধি নিষেধ। নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে ফলাকাঙ্ক্ষা করিবে না। এই উপদেশ কণ্ঠস্থ করিয়া ভাবনা করিলে কোন ফল হয় না। বাস্তব জীবনে কার্য্যে পরিণত করিলে তবে বাঞ্ছিত লাভ হয়। ভাগবত শাস্ত্রের মুখ্য বক্তব্য "ইতি কর্ত্তব্যতা" নহে। ভাগবতের লক্ষ্য হইল পুরাণপুরুষের নিত্য-নবায়মান লীলাকথার বর্ণনা করা। যে শাশ্বত সত্য ব্রজবনে প্রকটিত হইয়াছে তাহার সংবাদ ঘোষণা করা। ঐ ঘোষণা কর্ণগত হইলেই কল্যাণের উৎস খুলিয়া যায়। ইহাই ভাগবত শাস্ত্রের দাবী। এই রহস্যটি স্পষ্টতর হওয়া প্রয়োজন;

জীবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধটি অনাদি ও নিত্য। নিত্যবস্তু কস্মিন্ কালেও নাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সকল সময় তাঁহাকে ভুলিয়াই আছে এমন কি মুখে তাঁহাকে অস্বীকারও করে তাহারও কিন্তু নিত্য কৃষ্ণদাসত্ব সম্বন্ধটি বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কেবল মাত্র বিস্মৃতির আবরণে আবৃত থাকে।

লৌকিকে যেমন বাল্যজীবনের অনেক প্রিয় বন্ধুর কথা কর্ম্ম জীবনে স্মৃতিপটে থাকে না কিন্তু কেহ যদি দৈবাৎ সেই বাল্যবন্ধুর নাম উচ্চারণ করে ও তাহার রূপগুণ কার্য্যাবলীর কথা বর্ণনা করিয়া শোনায় তাহা হইলে তৎ শ্রবণে প্রাণ আনচান করিয়া উঠে। যতই শোনা যায় ততই বিস্মৃতির আবরণ কাটে। অবশেষে ভ্রান্তির পর্দ্দাখানি একেবারে সরিয়া গেলে প্রাচীন প্রীতি পুনঃ নবীনতা লাভ করে। তেমতি শ্রীকৃষ্ণ জীবের চির আপন জন। ব্রজের রসতত্ত্বই জীবের নিত্য বসতি। এই নিত্য সম্বন্ধ তাহার মনে নাই। সম্বন্ধের শাশ্বত সূর্য্যকে স্মৃতিভ্রংশতা-মেঘ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে। "মার্জ্জন হয় ভজন।" ভজন দ্বারাই ঐ মেঘের অপসারণ। নিত্য ব্রজকথা শ্রবণ-রূপ পবন-প্রবাহেই হইবে আবরণকারী মেঘের অপসৃতি। ব্রজের রাসলীলার কথা শুনিতে শুনিতেই প্রাণ প্রাণদয়িতের জন্য আকুল হইয়া উঠিবে। রাসলীলার উপসংহারে শ্রীশুক এই কথাটিই বলিয়াছেন—

"যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"

মাধুর্য্যঘন ব্রজ-প্রাপ্তির উপায় হইল নিত্যনবায়মান মধুরিম ব্রজকথার পুনঃ পুনঃ শ্রবণ অনুশীলন। ভ্রান্তির আচ্ছাদনটা

বড় গাঢ় ঘন. তাই উহা অপনোদনের জন্য প্রয়োজন বারংবার ঐ কথা আস্বাদন। কর্ণে আমাদের মল আছে, তাই শুনিলেও শোনা হয় না। কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না। সেই জন্য "নিত্যং ভাগবতং শৃণু।" নিত্য শোন, নিয়ত শোন, অভিনিবিষ্ট চিত্তে অখণ্ড মনঃসংযোগে শোন। শ্রবণকীর্ত্তনই চরম কল্যাণবহ। তিনিও অমৃত, তাঁর কথাও অমৃত। সে অমৃত কথা যিনি কীর্ত্তন করেন তিনিও পূর্ণামৃত আস্বাদন করেন, যিনি শ্রবণ করেন তাঁহারও পরমামৃত আস্বাদন হইয়া থাকে।

এই শ্রবণকীর্ত্তন জলসেকে ভক্তিলতা বাড়ে। শ্রীনারদ ভক্তিসূত্রে ভক্তিকে অমৃতস্বরূপা বলিয়াছেন। শ্রীগীতায় ভগবান কহিয়াছেন, "ভক্ত্যামামভিজানাতি"—ভক্তি দ্বারা আমাকে সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" "ভক্তিরেবভূয়সী"—শ্রীভগবান ভক্তির বশ, ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। "ভক্তিরেব বিষ্ণুপ্রিয়া।"

ভক্তিলতার বর্দ্ধনের পথে প্রবল বাধা আছে দুইটি। একটি হইল বৈষ্ণবাপরাধ, অপরটি হইল লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার সাধ। বিষ্ণুর অপত্য, এই অর্থে জীবমাত্রই বৈষ্ণব। তাহাকে পীড়া দেওয়া, অবজ্ঞা করা, নিন্দা করা ইত্যাদি বৈষ্ণবাপরাধ। অপরাধগুলি মুখ্যতঃ নৈতিক। দৈনন্দিন ব্যবহারে নৈতিক অপবিত্রতাই অপরাধ। নৈতিক (ethical) জীবন পূত না হইলে আধ্যাত্মিক (spiritual) সাধনা ফলবতী হইতে পারে না—নিরপরাধে ভজন করিবার ইহা অন্যতম তাৎপর্য্য।

৩

মানবের প্রতি, ভক্তের প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি ও আচরণ যাঁহার যত নির্ম্মল, তাঁহার সাধনা তত শক্তিশালী।

প্রতিষ্ঠার লোভ সাধন পথের অপর অন্তরায়। লক্ষ্যবস্তু পরম স্বামীর আসনে যখন আমরা আমাদের মলিন আমিত্বকে বসাইয়া ফেলি, ভক্তিলতার বর্দ্ধন তখন স্থগিত হইয়া যায়। কেবল তাহাই নহে। বিপদ বড়ই জটিল। সাধকের দৃষ্টি হরিপদ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজ পদ প্রতিষ্ঠায় নিবদ্ধ হইলে শ্রবণ কীর্ত্তন জলসেকের ফলও প্রতিকূল হইতে থাকে। জলসেকে প্রতিষ্ঠারূপী উপশাখাই বর্দ্ধিত হয়, মূল ভক্তিলতা স্তব্ধ হইয়া রয়।

আরাধ্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্যটি সুস্থির থাকিলেই কথিত বিপদ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আমিত্বকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়াই ভক্তিলতামূলে জলসিঞ্চন করিতে হয়। আমার যা কিছু সবই তোমার, এইরূপ ভাবনা দ্বারা আমিত্বকে ভুলিতে হয়। চন্দ্রের কিরণ মূলতঃ সূর্য্যেরই সম্পদ। "তোমারি গরবে গরবিনী হাম" এইরূপ বুদ্ধিতে স্থিত হইয়া ব্রজকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে হইবে।

এইরূপ ভাবে সাধন করিলেই ভক্তিলতা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে পৌঁছিবে। তখন ব্রজবন হৃদয়বন একাকার হইয়া যাইবে। কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ তাহা অন্তরে অনুভূত হইতে থাকিবে। ভক্তিলতায় পরম পুরুষার্থ প্রেমফল ফলিবে।

ভাগবতীয় এই সাধনতত্ত্ব মহাপ্রভু জগতকে দান করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে। মহাপ্রভুর দানের আরও

কিছু অভিনবত্ব আছে। তিনি শুধু ভক্তিধন (স্বভক্তিশ্রী) দেন নাই। উন্নত উজ্জ্বল রসবিশিষ্ট ভক্তিসম্পদ বিলাইয়াছেন। ইহা এক অঘটন ঘটনা ; ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই। তাই "অনর্পিতচরী" বলিয়াছেন। ঐরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে না বলিয়াই ঘটে নাই। কেন যে ঘটিতে পারে না, তাহাই প্রথমে বলিতেছি।

"উন্নত উজ্জ্বল রস" বস্তুটি হইল পরম সাধ্যবস্তু। ভক্তি হইল তৎপ্রাপ্তির সাধন। ভক্তি সাধনের ফল হইল প্রেম। প্রেমবস্তু ক্রমে গাঢ় গাঢ়তর হইতে থাকে। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব এই ছয় কক্ষা পার হইয়া প্রেম ক্রমে মহাভাব ভূমিতে পৌঁছে। উন্নত উজ্জ্বল রস এই মহাভাব ভূমিকার পরম বস্তু। এই চরমসাধ্য দ্বারা সাধনকে বিশেষিত করা একেবারেই অসম্ভব।

উপেয় কখনও উপায়ের বিশেষণ হয় না। গাড়ীতে উঠিয়া কাশীধাম গিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিবেন। গাড়ী উপায়, মণিকর্ণিকা উপেয়। মণিকর্ণিকা ঘাটবিশিষ্ট একটি গাড়ী, এ কথার যেমন কোন অর্থ হয় না, উন্নতোজ্জ্বল রসবিশিষ্ট ভক্তি, একথারও তেমন কোন তাৎপর্য্য হয় না।

"সামানাধিকরণ্য" না হইলে বিশেষ্য বিশেষণ হয় না। নীলত্ব পদ্মত্ব একই স্থানে থাকিলেই নীলপদ্ম এইরূপ প্রয়োগ চলে। ভক্তি রহিল পথে, আর উন্নতোজ্জ্বল রস রহিল ব্রজের সেবাকুঞ্জে। এই দুইয়ের বিশেষ্য বিশেষণ ভাব কেমন করিয়া হইবে ? এ' এক বিরাট প্রশ্ন। নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই

এই ঘটনা কখনও ঘটে নাই। ঘটে নাই বলিয়াই কেহ বাজারে আনে নাই। অনর্পিতচরী কথাটি গভীর ভাবেই সার্থক।

যাহা ঘটে নাই, ঘটিতে পারে না, তাহা ঘটিল কিরূপে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে। মহাপ্রভুর হার্দ্দ সাধ্যতত্ত্বটির আলোচনা করিয়া ক্রমশঃ এই প্রশ্নের সমাধানের দিকে দৃষ্টি করিব। বৈষ্ণব কৃপাহি কেবলম্।

[পাঁচ]

সাধ্যতত্ত্ব ও মহাপ্রভু

(ক)

সাধ্যতত্ত্ব শব্দের লৌকিক অর্থ যাহা, পারিভাষিক অর্থ তাহা নহে। নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের পরিভাষায় যুক্তি তর্ক দ্বারা অনুমিত বা স্থাপিত বস্তু হইল সাধ্য শব্দের বাচ্য। যেমন ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান হইল। এস্থলে বহ্নি হইল সাধ্য, ধূম হইল হেতু বা সাধন।

বৈষ্ণব আচার্য্যদের সাধ্য শব্দের প্রয়োগ আরও গভীর অর্থে। কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা সাধনীয় বস্তুই সাধ্য নহে, সমগ্র জীবনের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টার দ্বারা সাধন করিতে হইবে

যে বস্তু বা ভাবকে, তাহাই সাধ্য। অখণ্ড এই জীবনটা যে মহান্ উদ্দেশ্যে ভুবনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে ও পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছে, সেইটি হইল সাধ্যতত্ত্ব।

সংসারের সকলেই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সাধ্য বস্তুর দিকে ছুটিয়াছে। কারণ, সাধ্যতত্ত্বে পৌঁছিতে না পারা পর্য্যন্ত জীব আপন স্বরূপে বা স্বভাবে স্থিত হইতে পারে না। বরফ যেমন জল হইতে না-পারা পর্য্যন্ত গলিতে থাকে, জীবও সেইরূপ সাধ্যতত্ত্বে না-যাওয়া পর্য্যন্ত গতিশীলই থাকে। শান্ত হয় না।

শীতল বাক্সে বদ্ধ ও কাঠের গুঁড়ায় আচ্ছাদিত থাকিলে যেমন বরফের গলিতে বিলম্ব হয়, মায়ায় বদ্ধ ও সহস্র বাসনায় আবৃত হইলে জীবের তদ্রূপ সাধ্যপ্রাপ্তির পথে চলিতে বিলম্ব হয়। উক্ত আচ্ছাদন সরাইয়া তপ্ত-তর স্থানে রাখিলে যেমন তার বিগলনকে বাড়াইয়া তোলা যায়, তেমন অন্য বাসনা ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণানুরাগের তাপ দিলে জীবের অভিসারের বেগে তীব্রতা আধান করা যায়।

যে উপায়ে সাধককে সাধ্যের দিকে দ্রুততর লইয়া যাওয়া যায় তাহাই সাধন। ভক্তিই প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন ও শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধনের প্রধান অঙ্গ, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাধনতত্ত্বের দিগ্‌দর্শন হইয়াছে, এইবারে সাধ্যতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতেছে।

সাধ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অনুভব আছে। মহাপ্রভুর হার্দ্দটি আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

উহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থের নানা স্থানেই ছড়ান রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুশৃঙ্খলভাবে উহা সজ্জিত আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দ সংবাদে। উক্ত পরিচ্ছেদ অবলম্বনেই পরবর্ত্তী আলোচনা চলিবে।

সাধ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভুর হার্দ্দটি কি তাহাই খুঁজিতে হইবে। আমাদিগকে আর খুঁজিতে হইবে না। মহাপ্রভু নিজেই খুঁজিয়া রামরায়ের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। শাস্ত্রে যেখানেই দুইজনের মধ্যে আলোচনা, সেখানেই জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তা, কনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রোতা। গুরু বলিবেন, শিষ্য শুনিবেন। শুক উপদেষ্টা, পরীক্ষিৎ উপদিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ দাতা, অর্জ্জুন গ্রহীতা। ইহাই স্বাভাবিক।

শ্রীরামানন্দ সংবাদে উক্ত স্বাভাবিক নীতির বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। এখানে কনিষ্ঠ ব্যক্তি বক্তা, জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি জিজ্ঞাসু, শ্রোতা। ভক্ত বলিতেছেন, ভগবান শুনিতেছেন। এ যেন গীতার উল্টা পিঠ, কুরুক্ষেত্রের অন্তরের দিক। যিনি তৃষ্ণা মিটাইবেন, তিনিই তৃষ্ণাতুর। যিনি ভাণ্ডারী, তিনিই ভিখারী। এ এক গভীর রহস্য।

সাধন, ভজন, সাধ্যের অভিমুখে প্রধাবন, সাধ্য প্রাপ্তি এ সকল কার্য্য মূলতঃ ভক্তেরই। ভগবানের নয়। প্রেমভক্তি বস্তুটি ভক্তেরই সম্পদ। এই জন্যই ভক্ত কৃপায় ভক্তিলাভ, এই মর্ম্মে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। যার সম্পদ, যার অনুভবের সামগ্রী, আস্বাদনের বস্তু, তার মুখেই ত সেই কথা অধিকতর শ্রোত্র-মনোভিরাম। ভক্তিরসে ভক্তেরই অপরোক্ষ অনুভূতি,

ভগবানেরও অনুমিতি মাত্র। মধু-মাধুরীর গুণগাথা মধুকর-মুখেই মধুরতর। যদিচ মধুর আদিনিবাস পদ্মকোষে।

কবিরাজ গোস্বামী অপর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। জল সাগরেরই, দিয়াছে সে গোপনে সঞ্চার করিয়া মেঘকে। সেই সাগরই আবার শুক্তি কপাট খুলিয়া স্বাতী নক্ষত্রের ফোঁটা পাইবার আশায় হাঁ করিয়া আছে। উহা পাইলেই মুক্তাধন বাড়িবে, সাগর সম্পদশালী হইবে। দেওয়া বস্তুই ফিরে পাওয়া, কিন্তু লোভনীয় সুদের সহিত।

গৌর-বারিধি রামরায়-বারিদকে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বারি সঞ্চার করিয়া আবার শূন্য হৃদয়ে যাচ্ঞা করিতেছেন পাইয়া লাভবান হবেন এই লোভে। জলধি দেয় জল, পায় মুক্তা। গৌর কৃপানিধি সঞ্চার করিয়াছেন কৃপা, গ্রহণ করিবেন ভক্তের আস্বাদিত ভক্তিরস সিদ্ধান্ত। দাতাশিরোমণি করপুট পাতিয়া রামরায়ের কাছে ভিক্ষা চাহিলেন—

"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়"

প্রভু কেবল মাত্র রামানন্দের অনুভূতি শুনিতে চাহিলেন না, 'পড় শ্লোক' বলিয়া শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও জানিতে চাহিলেন। শাস্ত্রের বাণীর সঙ্গে নিজ অনুভবকে মিলাইয়া বলিতে বলিলেন। কেননা, বিদ্বদনুভূতি ও আপ্তবাক্য ইহার উপর আর প্রমাণ নাই।

যেমন জিজ্ঞাসার কৌশল, তেমনই উত্তরের চাতুর্য্য। উত্তর-দাতা প্রশ্ন পাইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সবখানি কথা বলিয়া শেষ করেন নাই। পদ্ম যেমন ক্রমে ফোটে, বাহিরের

পাপড়ি শক্ত, ক্রমে কোমল-তর, কিঞ্জল্কটি সম্পূর্ণ ফুটিলে বাহির হইয়া পড়ে, রায় মহাশয়ের উত্তরও সেইরূপ ধীরে আত্ম-বিকাশ করিয়াছে। বিকাশের ক্রমেতে শাস্ত্রে যে বিভিন্ন সাধ্যতত্ত্বের নির্দ্দেশ আছে তাহাদের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ ও পর্য্যায়ভেদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এমন স্তর-সমাবেশ ও বিন্যাসভঙ্গি শাস্ত্রে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

প্রথমে রামরায় "স্বধর্ম্ম আচরণকে" সাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন। "বর্ণাশ্রমাচারবতা" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক দ্বারা নিজ মত দৃঢ় করিলেন। বক্তার বক্তব্য এই যে, চারিবর্ণ ও চারি আশ্রম নিয়ন্ত্রিত সমাজে যিনি যে ভূমিতে আছেন তিনি যদি সেই ভূমির নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করেন, তাহা হইলে সমাজ-শৃঙ্খলাও অক্ষুণ্ণ থাকে, সমাজের মধ্যে মানুষের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্যও সফল হয়। ভগবানও প্রীত হন।

ভগবদ্গীতাতেও দেখা যায়, শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয়োচিত স্বধর্ম্ম পালন করিতে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" বলিয়া স্বধর্ম্মের জয় গাথা গাহিয়াছেন।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এক সময় গ্রীকজাতি দার্শনিক চর্চ্চায় অতি উন্নত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিল। গ্রীক দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ প্লেটোর (Plato) রিপাবলিক (Republic) গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত। ঐ গ্রন্থে ধর্ম্ম (Righteousness) কি ইহা লইয়া দীর্ঘ বিচার আছে। বহু গবেষণার পরে শেষে সিদ্ধান্ত

হইয়াছে—সমাজ-শৃঙ্খলায় যার যে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম তাহার যথাযথ প্রতিপালনই ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান সময় বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম নানাপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। তথাপি রামরায়ের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই ভাবে গ্রহণ করা যায় যে, নানাবিধ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে যে যেখানে গিয়া স্থিত হইয়াছে, সেইখানেই তার কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে। যে কর্ত্তব্যগুলি সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা সুষ্ঠুভাবে সুনির্ব্বাহ করাই তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত। রামরায়ের এই সাধ্য ভূমিকে Socio-ethical summum bonum বলা চলে।

রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু "ইহ বাহ্য" বলিয়া মন্তব্য করিলেন এবং "আগে কহ আর" বলিয়া মহত্তর সাধ্যের কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। "বাহ্য" অর্থ বাহিরের কথা। বাহিরের কথা বলিয়া যে সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে এমন কিছু নয়। মন্দিরের বহির্দ্বারও দ্বারই বটে, অতিক্রম করিতেই হইবে প্রবেশকারীর।

সামাজিক নৈতিক কর্ত্তব্য তো করিতেই হইবে, কিন্তু কার্য্য করিলেই কার্য্য করা হয় না। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।" কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম বিচার বড়ই সুকঠিন। ফলাকাঙ্ক্ষা যদি কর্ম্মের প্রেরক হয় কর্ম্মের উদ্দেশ্য যদি থাকে স্বার্থসিদ্ধি, তাহা হইলে সে কর্ম্ম যতই সুন্দর হউক প্রকৃত সুন্দর নয়। কর্ত্তব্য পালনের মূলে ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিতে পারে। সুতরাং যে ভূমিকায় দাঁড়াইলে কর্ম্ম সুষ্ঠু হয় তাহাই উন্নততর

সাধ্যভূমি হইবে। পূর্ব্বে প্লেটোর কথা বলা হইয়াছে, তিনিও স্বধর্ম্ম পালনকে চরম তত্ত্ব বলেন নাই, বলিয়াছেন ইহার পরও কিছু আছে। সেটি যে কি তাহা সুস্পষ্ট করেন নাই।

প্রভুর অন্তর বুঝিয়া রামরায় বলিলেন, "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার।" এই কথা বলিয়া গীতার "যৎ করোষি যদশ্নাসি" (৯।২৭) শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করিলেন। তাৎপর্য্য হইল এই যে, কর্ম্ম করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেই প্রকৃত কর্ম্ম করা হয়। যে কর্ম্মের ফলার্পণ ভগবচ্চরণে হয় নাই, আত্মসুখার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে, সে কর্ম্ম ব্যর্থ, কুকর্ম্মের তুল্য। গীতাতেও অর্জ্জুনকে তাহাই কহিয়াছেন, "কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নহে। যাহা কর, যাহা খাও, যে যজ্ঞ কর, যে তপস্যা কর, সকল কর্ম্মের ফলই আমাকে সমর্পণ কর।"

স্বধর্ম্ম পালনাদি কার্য্য যদি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সমর্পিত ভাবে করা যায় তাহা হইলেই তাহা ঠিক ঠিক করা হয়। কর্ম্মের ফল দ্বারা কর্ম্মের বিচার নহে। ফলের বৃহত্ব ক্ষুদ্রত্ব দ্বারা কর্ম্ম বড় ছোট নহে। কর্ম্মের বিচার কর্ম্মীর অন্তরের প্রেরণায়। ঐ প্রেরণায় যদি ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি থাকে তাহা হইলেই কর্ম্ম কর্ম্মযোগ পদবাচ্য ও মহান হইয়া থাকে। সাধ্যের এই ভূমিকে Super ethical বলা যায়। নীতির ভূমির মধ্যে নীতি অসম্পূর্ণ। নীতিকে ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক ভূমিকাতে গিয়াই নীতি সার্থকতা লাভ করে।

রামরায়ের সিদ্ধান্ত শুনিয়া প্রভু কহিলেন, "এহো বাহ্য,

আগে কহ আর”। প্রভু, এই সাধ্যকেও বাহ্য তোরণ কহিলেন। যেন অন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া উত্তর দিতে বলিলেন।

কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিলেও অনেক সময় কর্ত্তৃত্বাভিমান যায় না। কর্ম্ম করার কর্ত্তৃত্ব ও অর্পণ করার কর্ত্তৃত্ব থাকিয়াই যায়। ফলার্পণকারী ব্যক্তিরও অহংকার-বিমূঢ় অবস্থা ঘুচে না। যতক্ষণ অহং আছে ততক্ষণ অহঙ্কার থাকিবে। যদি কোন কৌশলে অহংকে একেবারে নির্ব্বাসিত করা যায়, তাহা হইলেই ফলাসক্তি-ত্যাগী ও কর্ম্ম-সন্ন্যাসী হওয়া যায়। তার ফলেই কর্ম্মযোগ হয়।

অহংকারকে নির্ব্বাসন দেওয়া যাবে কোথায়? যেখানে দেওয়া যাবে সেইখান হইতেই সে আবার ফিরিয়া আসিবে। একটি মাত্র স্থান আছে, যেখানে দিলে সে আর ফিরিবে না। রামানন্দ জানেন। জানিয়াই প্রভুর অন্তর বুঝিয়া কহিলেন— “স্বধর্ম্ম ত্যাগ সর্ব্বসাধ্যসার।” সঙ্গে সঙ্গে গীতার “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” (১৮।৬৬) শ্লোক উচ্চারণ করিলেন।

আত্ম নির্ব্বাসনের স্থান হইল ভগবচ্চরণে। সেই স্থানে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিলে সে চিরতরে গেল। কর্ম্ম করিয়া ফলার্পণ নহে, কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে আত্মার্পণ। পূর্ব্ব ভূমিকায় ফল দানের কথা ছিল, এখানে আত্মদানের কথা হইতেছে। নিজেকে যে দিয়াছে তার আর স্বধর্ম্ম কি। স্ব থাকিলে তো স্বধর্ম্ম। সেই সর্ব্বেশ্বরে স্ব সমর্পণের ফলে স্বধর্ম্ম আর নাই।

অথবা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবার ফলেই ধর্ম্মকর্ম্ম বা কর্ত্তব্যের বোঝা বা উপাধি বিহীন 'স্ব'কে তাঁর পায়ে সমর্পণ করা সম্ভব।

এই আত্মসমর্পণের (self dedication) আদর্শ গীতার পরম সংবাদ। আত্ম না থাকায় আত্মকর্ম্ম নাই। এই কর্ম্ম-হীনের কর্ম্ম'ই নিরবদ্য। বিশ্বনিয়ন্তার হাতে ক্রীড়নক হইয়া সে কর্ম্ম করে। পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম দু'য়ের অতীত হইয়া তাহার কর্ম্ম বিরাজমান থাকে। কর্ম্ম যেখানে মরিয়া গেল, সেইখানেই সে বাঁচিয়া রহিল।

এই সমর্পণের সাধ্য ভূমিতে দাঁড়াইয়াও মহাপ্রভু "ইহ বাহ্য, আগে কহ আর" ঘোষণা করিলেন। এই ভূমিকেও বহির্দ্বার বলিবার হেতু এই যে, সমর্পণটি পূর্ণাঙ্গ হইতে গেলে উহা জ্ঞান পূর্ব্বক হওয়া প্রয়োজন। তিনিই যে একমাত্র শরণ্য ইহা জানিয়াই শরণাগতি লইতে হইবে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে তাহার কোন ইঙ্গিত নাই।

অধিকন্তু, শরণাগতি গ্রহণে কোনও আশা ভরসা বা লোভ লালসা হেতু থাকিলে পূর্ণাঙ্গতা হইবে না। উক্ত শ্লোকে ভরসা দেওয়া হইয়াছে—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" হে অর্জ্জুন, তুমি যদি সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমার শরণাগত হও তাহা হইলে আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্তি দিব। তোমার শোকের আর কোন কারণ থাকিবে না। যদি এই বাক্যের ভরসায় কেহ শরণাগতি গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার ঐ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না।

আরও সূক্ষ্ম কথা এই যে, সব ছাড়িয়া শরণাগত হও এই

উপদেশ শুনিয়া যিনি শরণাগতি লইবেন, তাঁর শরণাগতি অনবদ্য হইবে না। অন্তরের স্বতঃ আকর্ষণে যাহাদের আত্ম সর্ব্বতো-ভাবে সমর্পিত হইয়া যাইবে তাহাদের পক্ষে উপদেশের প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না—ভরসা পাইবার আবশ্যকতা থাকিবে না। ব্রজে যাঁদের সর্ব্বসমর্পণ হইয়াছিল তাঁদের পাপ পুণ্যের ভাবনা ছিল না, মুক্তি মোক্ষের আশা ছিল না। সেটি হইয়াছিল যে-পরাভক্তির বলে, প্রভু রামরায়কে সেই দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন।

প্রভুর অন্তরের আকুতি অনুভব করিয়া রামরায় গন্তব্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া আর এক পা অগ্রসর হইলেন। এ যেন শুক্লপক্ষের চন্দ্রমা। প্রতিদিন এককলা করিয়া বাড়িতেছে। রামরায় বলিলেন, "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিসাধ্য সার।" কথা বলিয়াই ভগবদুক্তি—শ্লোক পাঠ করিলেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥১৮।৫৪

একমাত্র জ্ঞান-ভূমিতেই সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্মের লয় হইতে পারে। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" জ্ঞান-ভূমিতে একেবারে লয় পাইয়া ভক্তি-ভূমিতে উহা আবার নবজন্ম পরিগ্রহ করিবে। ইহাই এই সাধ্য ভূমিকার হার্দ্দ। এই জন্যই "জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি" কহিলেন। এই স্তরে complete self surreuder সাধ্য বিদ্যমান।

একমাত্র শরণ্য তিনি, এই জ্ঞান হইলেই শরণাগতি জাগিবে। একমাত্র ভক্তিই শরণ্যের দিকে টানিয়া লইয়া

যাইবে। অন্য কোন উপদেশ বা ভরসা বাণী নহে। এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি-ভূমিতে আরোহণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অবস্থাটি পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইবে।

তাহাতে আপনাকে অর্পণ না করিয়া পারি না, তাই সমর্পণ' তার ফল পাপপুণ্য কিম্বা স্বর্গ নরক সে বিবেচনা নাই। এই ভাবে সমর্পণে পূর্ণতা আসিলেই ভক্ত সাধক পরব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভূত হইবে। তখন ভক্ত-ভগবানের প্রাণের স্পন্দন এক হইয়া যাইবে। তখন সে তদ্গত ব্রহ্মগত, ব্রহ্মভূত ব্রহ্মময়। অগ্নি প্রবেশে লৌহ যেমন অগ্নিময়। ভক্তির উদয়ে চিত্ত তখন চির প্রসন্ন সদা আনন্দময়। জ্ঞানের উদয়ে সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সর্ব্বাত্মময়। এই আত্মময়, আনন্দময়, ব্রহ্মময় অবস্থাই সাধ্যসার।

শ্রীল রামানন্দ গীতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া প্রভুর শ্রীমুখের দিকে চাহিলেন। গীতার উন্নততম সাধ্য-পীঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুগম্ভীর কণ্ঠে প্রভু গৌরহরি বলিলেন—"এহো বাহ্য আগে কহ আর।" কেন, কি জন্য প্রভু এমন কথা বলিলেন—এইবারে বিবেচনা করিব।

[ছয়]

সাধ্যতত্ত্ব

[খ]

গীতার সর্ব্বোচ্চ ভূমি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। রামানন্দ রায় তাহাই সাধ্যসার কহিয়াছেন। প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সাধ্যকে "এহো বাহ্য" বলিয়া আরও আগে শুনিতে চাহিয়াছেন। প্রভুর সঙ্কেতে সুরসিক রামরায় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রভু "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং" উত্তমা ভক্তির কথা শুনিতে চাহিতেছেন।

রামরায় জানেন যে, সমগ্র মহাভারত ও তদন্তর্গত ভগবদ্ গীতা রচনা শেষ করিয়াও বেদব্যাস চিত্তের প্রশান্তি লাভ করেন নাই। পরে নারদকৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত প্রকট করিয়া পরাশান্তির সন্ধান লাভ করেন। রামরায় তাই গীতার সর্ব্বোচ্চ সিঁড়িতে উঠিয়া ভাগবতের দুয়ারে পদক্ষেপ করিলেন। ভাগবতের ব্রহ্মস্তুতির "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" ইত্যাদি শ্লোকের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার ॥"

জ্ঞানমিশ্রা আর জ্ঞানশূন্যা এই দুইটি ভক্তি-ভূমিকার পার্থক্য বুঝিতে হইবে। শব্দ দুইটি শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপাততঃ মনে হয়, প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টি কিছু লঘু। কারণ, প্রথমটিতে জ্ঞান আছে, দ্বিতীয়টিতে নাই। একটি

বস্তু কমিয়া যাওয়ায় ভূমিটা দুর্ব্বল হইয়া যাইবার কথা। রামরায় কি তবে অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টায় পশ্চাৎপদ হইলেন ?

এই আপাত প্রতীতি বস্তুতঃ যথার্থ নহে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে, ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান আছে ইহাত ঠিকই। কিন্তু জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে যে জ্ঞান নাই তাহা নহে। এই না-থাকা, লুপ্ত হইয়া নহে, পূর্ণতায় পৌঁছিয়াই। জ্ঞানশূন্য অর্থ জ্ঞানের ক্রিয়াশূন্য। পূর্ণতায় পৌঁছিলেই জ্ঞান ক্রিয়াহীন হয়।

কলসী যতক্ষণ জলে পূর্ণ না হয় ততক্ষণই তার শব্দ থাকে। জ্ঞান যতক্ষণ চরম ভূমিতে না যায় ততক্ষণই তার সত্তার অভিব্যক্তি থাকে। জ্ঞান যে আছে, ইহা যে বুঝিতে পারা যাইতেছে ইহা হইতেই স্থির জানা গেল যে, জ্ঞান চরম সীমান্তে পৌঁছে নাই। পূর্ণ কলসী আর শূন্য কলসী এই দুইয়ে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই শব্দহীন। একান্ত জ্ঞানহীনের ভক্তি আর জ্ঞানবানের ভক্তি দুইয়ে সাদৃশ্য আছে। গাভীর বৎস-প্রীতি আর ব্রজজননীর গোপাল-প্রীতি ইহাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য।

ভগবানকে ভগবান জানিয়াই ভক্তি করিতে হইবে। একথা সত্য। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য কথা হইল যে, যতক্ষণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতেছি, ততক্ষণ ভক্তি গাঢ় হইতেছে না। তিনি ভগবান, এই ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি ভক্তিকে "শিথিল" করিয়া দিতেছে। মহাপ্রভু শিথিল ভক্তির কথা শুনিতে চাহিতেছেন না।—গাঢ় ভক্তির জন্যই তাঁহার আকূতি।

জল অপেক্ষা মাটি গাঢ়, মাটি অপেক্ষা কাষ্ঠখণ্ড গাঢ়তর, কাষ্ঠখণ্ড অপেক্ষা লৌহখণ্ড গাঢ়তম। ইহার কারণ এই যে, জলে হাতখানি অবলীলাক্রমে প্রবেশ করান যায়, মাটিতে একটি শলাকা সজোরে প্রবেশ করান যায়, কাষ্ঠে একটি তীক্ষ্ণ পেরেক খুব শক্ত আঘাতে প্রবেশ করান যায়, লৌহখণ্ডে কিছুই প্রবেশ করান যায় না। অন্য বস্তু প্রবেশ করিবার অবকাশ যেখানে যত কম, তাহা তত গাঢ়।

"তিনি ভগবান" এই বুদ্ধিটি ভক্তির মধ্যে প্রবেশ করিবার অবকাশ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাহা গাঢ়তম নহে। যে ভক্তির মধ্যে ভগবত্তানুসন্ধান প্রবেশ করাইবার বিন্দুমাত্র ফাঁক নাই তাহাই গাঢ়তম ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি। এই শুদ্ধাভক্তির দিকেই প্রভুর দৃষ্টি।

এখানে একটি সমস্যা দাঁড়াইল। "স্বধর্ম্ম ত্যাগ" ভূমি হইতে "জ্ঞানমিশ্রা" ভূমিতে আসিবার কালে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র শরণ্য তিনি এই জ্ঞান হইতেই শরণাগতি আসিবে। ভক্তিই শরণ্যের দিকে টানিয়া নিবে। জ্ঞান-ভূমিকাতেই ভক্তির স্থিতি হইবে। এখন পুনরায় বলা হইতেছে যে, জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত ভক্তি শুদ্ধা হইবে না। জ্ঞান না থাকিলেও ভক্তি আসিবে না—আবার জ্ঞান থাকা পর্য্যন্তও ভক্তি স্বরূপে পৌঁছিবে না।

এ কথার সমাধান এই যে, জ্ঞান হইতেই ভক্তি (আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি) দেখা দিবে, কিন্তু জ্ঞানশূন্যা হইয়াই আপনাকে স্বরূপতঃ প্রকাশ করিবে। জ্ঞানশূন্যা হইবে জ্ঞানকে সরাইয়া

দিয়া নহে। নিবিড়তর ভাবে জ্ঞানকে আত্মসাৎ করিয়াই ভক্তি জ্ঞানশূন্যা হইবে। জানা এত বেশী যে, না জানার তুল্য। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় জ্ঞানী জ্ঞানহীন শিশুসম।

কর্ম্ম কর্ম্মার্পণে পূর্ণতায় পৌঁছিয়া বিদায় লইয়াছে। তারপর জ্ঞান আসিয়াছে। পূর্ণতায় পৌঁছিয়া জ্ঞান এবার বিদায় লইতেছে। শুদ্ধা-ভক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতেছে। জ্ঞানকর্ম্মের আবরণ-শূন্যা ভক্তিই উত্তমা ভক্তি। শুদ্ধা-ভক্তিতে কর্ম্মজ্ঞানের অত্যন্তাভাব এই প্রতীতি ভ্রান্ত। কর্ম্মজ্ঞান পূর্ণতমতায় আপনাদের বিসর্জ্জন দেয় শুদ্ধা-ভক্তিতে। জ্ঞানকর্ম্মের নদী ভক্তি-সাগরে আসিয়া আপনাদের নাম গোত্র হারাইয়া ফেলে।

যে আপন নয় তার জন্যই কর্ম্ম করি এবং করি যে তা জানি। যে আপন নয় তাকেই জানি। জানি যে তাও জানি। যে অতি আপন তার জন্য যা করি তা কর্ম্ম নয়, তাকে যে জানি তা জানা নয়। আমি যেমন আমার দেহকে জানি। আমার দক্ষিণ হস্ত যেমন আমার বাম হস্তের সেবা করে। খোকাকে প্রতিবাসীরা ভালবাসে ভালছেলে বলিয়া, মা ভালবাসে তার খোকা বলিয়া, ভালছেলে বলিয়া নহে।

ভগবানকে ভগবান বলিয়া যারা ভক্তি করে, তারা প্রতিবেশী। কৃষ্ণকে আপনজন বলিয়া যারা ভালবাসে তারা ঘরের লোক। এই ঘরের লোকের মত তাঁকে পাওয়াই মহাপ্রভুর হার্দ্দ। তাই জ্ঞানমিশ্রাকে বাহ্য বলিয়াছেন। এই ঘরোয়া ভক্তির খবর ভাগবতে। রামরায়ও তাই প্রভুর অন্তর

বুঝিয়া গীতার জ্ঞানভক্তি সমুচ্চয় ছাড়িয়া ভাগবতের শুদ্ধা-ভক্তির ভূমিতে প্রবেশ করিতেছেন।

রামানন্দ ব্রহ্মস্তুতির যে শ্লোকটি তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি অভিনব সঙ্কেত আছে। শ্লোকটির ভাবার্থ এই যে—ব্রহ্মা বলিতেছেন, হে প্রভু, যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা সর্ব্বতো-ভাবে ত্যাগ করিয়া ভক্তসঙ্গে বাস করিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার বার্ত্তা শ্রবণ মনন উচ্চারণ করতঃ তোমার মধুরিমা আস্বাদনেই জীবন ধারণ করে, তুমি সর্ব্বত্র অজিত হইলেও এই ত্রিভুবনে একমাত্র তাহাদের দ্বারাই "জিত" হইয়া থাক।

"যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈ স্ত্রিলোক্যাং।"

যিনি সর্ব্বত্র অজিত তিনি এতাদৃশ ভক্তের কাছে পরাজিত। এই কথাটির মধ্যেই অভিনব সংবাদটি রহিয়াছে। ভক্তির দ্বারে ভগবান পরাজিত হন। কখন হন? যতক্ষণ ভক্ত তাঁকে ভগবান বলিয়া জানে ততক্ষণ হন না। যখন তত্ত্বজ্ঞানে অনুসন্ধান-শূন্য অবস্থা আসে তখনই হন।

এইরূপ হইবার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভগবান স্বীয় ভগবত্ত্বভূমিতে থাকিলে কুত্রাপি "পরাজিত" হইতে পারেন না। যদি কোন প্রকারে ভগবান আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, ভগবত্ত্বভূমিতে না থাকেন তাহা হইলেই তাঁহার পরাজয় সম্ভব। ভক্ত যতক্ষণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানে ততক্ষণ তিনি ভগবানই থাকেন। আপনাকে ভুলিতে পারেন না। ইহা ভগবানের একটি বিশেষ স্বভাব।

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

এই কথাটিই গীতায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকে ঘোষিত হইয়াছে। ভক্ত যতক্ষণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতেছেন, ততক্ষণ তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না যে তিনি ভগবান। সুতরাং কাহারও দ্বারা "জিত"—হইবার সম্ভাবনা হইতেছে না। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি-ভূমিতে ভগবান সর্ব্বত্রই অজিত, কুত্রাপি জিত নহেন। তাই মহাপ্রভু "বাহ্য" বলিয়াছেন। যেই মাত্র ভক্ত ভুলিয়া গেল যে তিনি ভগবান, তৎক্ষণাৎ তিনিও ভুলিয়া গেলেন যে তিনি ভগবান। অর্থাৎ তিনি আত্মহারা হইয়া গেলেন। তখনই তিনি ভক্তের ভক্তির অধীনতা স্বীকার করেন। সুতরাং জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতেই অজিত "জিত" হইয়া থাকেন। তাই, প্রভুর অন্তর জানিয়া রামরায় জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা কহিলেন। এই জ্ঞানশূন্যতাতেই জ্ঞানের পরিপূর্ণতা। জ্ঞানের পরিপূর্ণতায় কর্ম্মের চরিতার্থতা। সুতরাং এই ভূমিকাতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্তরগুলির সার্থকতা।

এইরূপে ভাগবতীয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর শ্রীমুখের দিকে তাকাইলেন। বদনপদ্মে ঈষৎ হাসি ফুটিল বৃষস্কন্ধখানি একটুখানি দক্ষিণে হেলাইয়া প্রভু কহিলেন —"এহো হয়।"

জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই যে উত্তমা ভক্তি এবং তাহাই যে সাধ্য এই সিদ্ধান্তে প্রভু আপন সম্মতি জানাইলেন। সম্মতি জানাইয়াও

"আগে কহ আর" বলিয়া আরও নিগূঢ়তর সাধ্যের কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

রামরায় উত্তর করিলেন, "প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার।" জ্ঞানশূন্যা ভক্তি আর প্রেমভক্তি কথা প্রায় একই, তবে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও আছে। জ্ঞানশূন্যায় জ্ঞান নাই বটে—কিন্তু জ্ঞান যে নাই তার জ্ঞান আছে। অন্ধকার গৃহে যদি চক্ষু খুলিয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে অন্ধকার যে আছে ইহা দেখিতে পাই। অর্থাৎ কিছু যে দেখিবার নাই ইহা যেন দেখি। আর চক্ষু যদি বুজিয়া থাকি তাহা হইলে দেখিবার যে কিছুই নাই তাহাও দেখি না। জ্ঞানশূন্যায় জ্ঞানাভাস আছে। প্রেমভক্তির ভূমিকায় তাহাও নাই।

অন্ধকার গৃহে চক্ষু বুজিয়া যেমন নিজের অন্তরকেই দেখিতে চেষ্টা পাই, প্রেমভক্তির ভূমিকাতেও সেইরূপ ভক্তিদেবীর অভ্যন্তরটি দর্শন লাভ করি। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি পর্য্যন্ত ভক্তি-দেবীর বাহিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিই যেন ব্যক্ত হয়—তাঁর অন্তরের দিকটা প্রেমভক্তির ভূমিকাতেই প্রকট হইয়া উঠে। জ্ঞানশূন্যায় ভক্তির ফুটন্ত ফুল দেখি। প্রেমভক্তিতে ফুটন্ত ফুলের অন্তরের মনমাতান সৌরভটি ভোগ করি।

প্রেমভক্তির বুকে লুকান ঐ সৌরভটি হইল—কৃষ্ণতৃষ্ণা। শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিবার জন্য দারুণ ক্ষুধা প্রেমভক্তির ভূমিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে। এই তথ্যটি সুপরিস্ফুট করিবার জন্য রায় মহাশয় অনুকূল শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্মৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্থ ভক্ষ্যপেয়ে॥

যত উপচারেই পূজা হউক না কেন, হৃদয়ের শুদ্ধ প্রেম যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে গলাইয়া দিতে পারে তেমন আর কিছুতেই পারে না। উদরে বলবতী ক্ষুধা পিপাসা থাকিলেই খাদ্য পানীয় আনন্দদায়ক।

সত্যসত্যই ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিলে সম্মুখস্থ সুন্দর সুন্দর খাদ্য পানীয় কেবল দর্শনের সামগ্রী, রসনার তৃপ্তিদায়কও নহে —শরীরের পুষ্টিকারকও নহে। তদ্রূপ জ্ঞানশূন্যা ভক্তি-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য কেবল প্রশংসার সামগ্রী, আস্বাদনের বা সম্ভোগের নহে। ভোগ করিতে হইলে চাই ক্ষুধা। এই ক্ষুধাই প্রেমভক্তির প্রাণ। তাই প্রভু আরও আগে শুনিতে চাহিলে রায় রামানন্দ জ্ঞানশূন্যার পর প্রেমভক্তির কথা বলিলেন।

প্রেমভক্তি সাধ্য-ভূমির আরও একটি বিশেষত্ব আছে, যাহা জ্ঞানশূন্যা ভক্তি-ভূমিতে নাই। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি পর্য্যন্ত সাধ্যবস্তু শাস্ত্রবিধি মত চেষ্টা বা সাধনা দ্বারা লভ্য হইতে পারে। শাস্ত্রোক্ত পথে ও মতে আচরণ অনুষ্ঠানের ফলে উহার প্রাপ্তি হইতে পারে। কিন্তু প্রেমভক্তি বস্তু কোন প্রকার প্রয়াস-সাধ্য সামগ্রী নহে। উহা একান্ত ভাবেই প্রসাদ-লব্ধ। প্রচেষ্টায় নয়, কৃপাতেই উহা লভ্য হইতে পারে।

এই কৃপাটির প্রকাশ অন্তরে লোভরূপে। মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের

সাজান মিঠাই যেমন চিত্তে লোভের উদয় করায়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অন্তরে লোভ সৃষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনায় বৈষ্ণব মহাজনেরা লিখিয়াছেন— "প্রতি অঙ্গে পিরীতি পসার।" ঐ প্রীতিরসের পসরা এমনি চিত্তাকর্ষকভাবে সুসজ্জিত যে, তদ্দর্শনে অন্তরে লোভের উৎপত্তি হয়। এই লোভই বস্তুকে মিলাইয়া দেয়।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। বিপণিতে সাজান মিষ্টান্ন সকল সময় লোভ না-ও জন্মাইতে পারে। কিন্তু কেহ যদি ঐ মিঠাই ক্রয় করিয়া আমাকে দেখাইয়া আমার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ ভোজন করে, তখন তৎপ্রতি লোভ সংবরণ করা বেশ একটু কঠিন হইয়া পড়ে। সেইরূপ কোন ভক্ত যখন কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করে, আস্বাদন করিতে করিতে মন প্রাণ তাঁহার কৃষ্ণভক্তি রস-ভাবিত হইয়া পড়ে, আনন্দ হিল্লোলে হৃদয় দুলিতে থাকে, তখন তদ্দর্শনে বা মননে হৃদয়ে লোলুপতা জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। ঐ লৌল্যই প্রেমভক্তির প্রাণ। ঐ লোলুপতাই বস্তু প্রাপ্তির পক্ষে "একলং মূল্যং"—একমাত্র দাম। ইহা ছাড়া কোটী জন্মার্জ্জিত আর কোন প্রকার সুকৃতিই নাই, যদ্দ্বারা পরাৎপর বস্তু শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন হইতে পারে। অন্তরের এই তথ্যটিকে প্রকাশ করিবার জন্যই রামরায় আরও একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।

তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি সুকৃতৈ র্ন লভ্যতে ॥

সম্মতি-সূচক ইঙ্গিত করতঃ আনন্দময় প্রভু মধুর হাস্যে কহিলেন, "এহো হয়।" কৃষ্ণতৃষ্ণাময় প্রেমভক্তিই জীবের পরম সাধ্য ইহাতে আর সংশয় কি থাকিতে পারে? তথাপি নিগূঢ়তর রহস্য আস্বাদন মানসে প্রভু কহিলেন—

"রায়, আগে কহ আর।"

কৃষ্ণতৃষ্ণাময়, প্রেমভক্তির পর প্রভু আর কি শুনিতে চাহিতেছেন, রসবেত্তা রামানন্দ তাহা অন্তরে অনুভব করিয়া উত্তর করিলেন—"রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।"

প্রেমভক্তি সরসীর মত, স্রোত নাই। বিশিষ্ট কোন সম্বন্ধের অনুভূতি জাগিলেই সরোবরে প্রবাহ খেলে, স্রোতস্বিনী হইয়া বহিয়া চলে। সম্বন্ধানুগ হইয়া প্রেমভক্তি রসতা প্রাপ্ত হয়।

প্রেমভক্তি বীণার তার, সম্বন্ধের একনিষ্ঠা তাহাতে ঝঙ্কার। প্রেমভক্তি মূক, সম্বন্ধের বোধ তাহাকে মুখর করে। দাস প্রভু সম্বন্ধেই প্রেমভক্তির একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠে। ভক্তি যেন নিরাকার, সম্বন্ধ তাহাকে রূপবান্ করে।

শান্ত প্রেমভক্তি দাস্যে আসিয়া রস-সাগর-মুখে গতিশীলা হয়। গতিমত্তাতেই প্রেমভক্তির অশেষ বিচিত্রতা আত্মপ্রকাশ করে। সম্বন্ধ-নিষ্ঠ প্রেমভক্তির কথা প্রভু শুনিতে চান বুঝিয়া রামরায় ভাগবতের শ্লোক তুলিয়া এই সাধ্যভূমিকে স্থাপন করিলেন।

যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥

যাঁহার নামটি মাত্র শ্রুতিগত হইলে ত্রিভুবন পবিত্র হয়, যাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বতীর্থ সতত বিরাজমান, তাঁহাকেই যাঁহারা একমাত্র প্রভু জানিয়া নিজেকে তাঁহার দাসানুদাস স্বরূপে স্থিত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রাপ্য বস্তু আর কী বাকি থাকিতে পারে?

বস্তুতঃ জীবমাত্রেরই স্বরূপ হইল কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্যই জীবের চরম পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। ইহা পাইলে আর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না। প্রভুও তাই "এহো হয়" বলিয়া রায় মহাশয়কে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিলেন। সমর্থন করিয়াও "আগে কহ আর" বলিয়া গূঢ়তর রহস্যের আস্বাদন লালসে তৃষ্ণাতুরের মত রামরায়ের বদন পানে তাকাইয়া রহিলেন।

[সাত]

সাধ্যতত্ত্ব

[গ]

দাস্যপ্রেম সাধ্যসার বলিয়া শ্রীল রামানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক উচ্চারণ করতঃ শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীবদনপদ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। শ্রীমস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া রায়ের সিদ্ধান্তে সম্মতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীপ্রভু কহিলেন,

"রায় এহো হয়।" তৎপর গভীরতর তত্ত্ব শুনিবার আগ্রহে বলিলেন, "আগে কহ আর।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর অন্তর অবগত হইয়া রায় মহাশয় কহিলেন, "সখ্য-প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।" দাস্য-প্রেমের পর কেন প্রভু আরও "আগে" শুনিতে চাহিলেন এবং রামরায় কেন সখ্য-প্রেমের কথা বলিলেন, ইহা আলোচনার বিষয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্বন্ধ-জ্ঞান স্পষ্ট না হইলে প্রীতির রূপটি প্রস্ফুটিত হয় না। সম্বন্ধের অনুভূতিই নিরাকার-ভালবাসাকে রূপবান করে। রূপায়িত না হইলে প্রীতি প্রিয়ের সুখবিধানে পর্য্যাপ্ত হয় না। "তুমি প্রভু আমি দাস", এই সম্বন্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষ্ণ-প্রীতির একটি বিশিষ্ট আকৃতি পরিব্যক্ত হইয়া উঠিল।

"দাস্য-প্রেম" কথাটিতে ইহাই বোঝা যায় যে, "আমি দাস, কৃষ্ণ প্রভু" এই অনুভবে তাঁহাকে ভালবাসা। কৃষ্ণকে ভালবাসাই কিন্তু জীবের চরম সাধ্য নহে। ভালবাসিয়া তাঁহার সেবা করা, সেবা করিয়া তাঁহার সুখবিধান করা ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ। নিজেকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়ের সুখেতে তন্ময়তা প্রাপ্তিই হইল শেষ লক্ষ্য।

সেব্য ও সেবকের মধ্যে ব্যবধান যত অধিক হইবে, সেবায় আত্মবিসর্জ্জন তত বাধাপ্রাপ্ত হইবে। বড়ত্ব বুদ্ধি যত প্রবল হইবে সেবাকার্য্যে সঙ্কোচ তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সঙ্কোচ, প্রীতির প্রসারতায় ক্ষুণ্ণতা আনিবে। সর্ব্বাঙ্গীণ সেবার সম্ভাবনা

রহিত হইবে। বস্তুতঃ ব্যবধানের বোধ আত্মদানের পূর্ণতার পথে বাধক-স্বরূপে স্থিত রহিবে।

দাস মনে করে কৃষ্ণ আমার প্রভু। "কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।" প্রভু হইলেই তিনি ভৃত্য অপেক্ষা অনেক বড়। বড় ও ছোটোর মধ্যে ব্যবধান বেশ বৃহৎ। বড় যিনি তাঁর সেবাতে ছোট জনের একটা সঙ্কোচভাব থাকিলে আত্মবিসর্জ্জনটি কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না।

অধিকন্তু, দাসের প্রকৃত কার্য্য সেবা করা নহে। আজ্ঞা-পালনই দাসের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। প্রভুর আজ্ঞা যদি এমন হয় যে তাহা তৎসন্নিধানে বাসপূর্ব্বক সেবার বাধক, তাহা হইলে দাসকে আজ্ঞাপালনই করিতে হইবে, আজ্ঞালঙ্ঘনপূর্ব্বক মনের সাধ মত সেবা করা চলিবে না।

প্রীত্যাধিক্যে আজ্ঞালঙ্ঘনেও কৃষ্ণের সুখাতিশয় হইয়া থাকে। "প্রেমে আজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় কোটী সুখ পোষ।" তবে সেই প্রেম, দাস্য-প্রেম নহে। ভৃত্যের আজ্ঞালঙ্ঘনের অধিকার নাই। মহাবীর হনুমানের দাস্য-প্রেম। প্রভু রামের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া সেবার অধিকার তাঁহার নাই। শ্রীরামের শ্রীচরণ তলে বসিয়া পদসেবার ভাগ্যই তাঁহার নিয়ত কাম্য। তাহাতেও বঞ্চিত হইতে হয়, যদি প্রভু রাম আজ্ঞা করেন— "যাও হনুমান, সীতার অনুসন্ধানে অগ্রসর হও।"

শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানে ঐ সকল দাস্যোচিত বাধা যাহাতে বিন্দুমাত্র না থাকে এমন একটি উন্নততর প্রীতির ভূমিতে শ্রীরামরায়কে তুলিবার জন্য মহাপ্রভুর অন্তরের আকুতি

মর্ম্মীভক্ত রামানন্দ প্রভুর অন্তরের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সখ্য-প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।"

এই কথা বলিয়াই রামরায় সখ্য-প্রেমের পোষক শ্লোক উচ্চারণ করিলেন শ্রীমদ্ভাগবত হইতে। মহারাজ পরীক্ষিত প্রতি শ্রীশুকমুখোক্তি—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

যাঁহারা শান্তরসের তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত, তাঁহাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ মাত্র ব্রহ্মসুখানুভূতিরূপে অনুভূয়মান। যাঁহারা দাস্যভাবগত ভক্ত, তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পরম আরাধ্যতম দেবতারূপে বিরাজমান। যাহারা মায়াবদ্ধ অজ্ঞলোক, তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ অতি সাধারণ নরশিশুরূপে প্রতীয়মান। শ্রীবৃন্দাবনের পূতচরিত্র ব্রজবালকগণের নিকট লীলারঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ নিত্য অশেষবিধ ক্রীড়াকৌতুকের সঙ্গী, খেলার সাথী।

ব্রজের বালকগণের শ্রীকৃষ্ণে সখ্য-প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ যে কত বড় এই জ্ঞান তাহাদের নাই। প্রেমই ঐ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। "তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম" ইহাই হইল তাহাদের অন্তস্তলের অনুভূতি। দাস্যের ব্যবধান বোধ, বড়ত্বের জন্য সঙ্কোচ, সখ্যপ্রেম ঘুচাইয়া দিয়াছে। গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে উঠিয়াছে। উচ্ছিষ্ট ফল খাইয়াছে, খাওয়াইয়াছে।

সখ্যরসকে বলা হইয়াছে বিশ্রম্ভ-প্রধান। বিশ্রম্ভ শব্দের অর্থ অভেদ-মনন। সখ্যরসের এমনই সামর্থ্য যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখাদের একটা অভিন্নতার বোধ জাগাইয়া দেয়। সখার কাছে তাহার নিজদেহে ও কৃষ্ণদেহে বিন্দুমাত্র ভেদবুদ্ধি থাকে না। নিজচরণ নিজগায়ে ঠেকিলে যেমন উদ্বেগের কারণ হয় না, কৃষ্ণগায়ে ঠেকিলেও সেইরূপই উদ্বেগ হয় না। আমার উচ্ছিষ্ট আমার মুখে যাওয়াও যা, কৃষ্ণ মুখে যাওয়াও তাই। এই দুই মুখে কোন ভেদবুদ্ধি কৃষ্ণসখার অন্তরে জাগেই না। এই অভিন্নমননই সখ্যপ্রেমের প্রাণস্বরূপ।

শ্রীরামরায়ের উত্তরে শ্রীশ্রীপ্রভু পুলকিতাঙ্গ হইলেন। পরম উল্লাসভরে কহিলেন, "রায়, এহোত্তম" ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য। এই প্রেমের উদয়ে আত্মসম্বন্ধীয় সমস্ত ভাবনার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটে, আত্মবিসর্জ্জন পূর্ণ হয় এবং কৃষ্ণ-সুখসাধন চিন্তাই এক ও অদ্বিতীয় রূপে বিরাজমান থাকে।

সখ্যপ্রেমের উত্তমত্ব স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু সস্মিতবদনে শ্রীরামরায়ের দিকে চাহিলেন। নয়নের কোণে আরও নিবিড়তর আস্বাদন লালসা ব্যক্ত করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "রায় আগে কহ আর।" মর্ম্মীভক্ত প্রভুর অন্তর বুঝিয়া কহিলেন—"বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।"

কথাটি বলিতেই রামরায়ের স্মরণে জাগিল শ্রীমদ্ভাগবতের মৃদ্ভক্ষণ ও দামবন্ধন লীলা। কারণ ঐ দুই লীলাতেই বাৎসল্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঐ লীলাকথা হইতে দুইটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন নিজ সিদ্ধান্তের অনুকূলে।

তন্মধ্যে একটি মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তি, অপরটি শ্রীশুকের উক্তি।

নিজমুখেই "উত্তম" বলিয়া প্রভু আবার "আগে" শুনিবার আগ্রহ করিলেন কেন? এই তত্ত্বটি ভাবনা করিতে হইবে। রামরায়ের উত্তরের দিগ্‌দর্শনীটি থাকায় আমাদের প্রভুর হার্দ্দ কি তাহা ভাবনা করার সুযোগ হইতেছে, নতুবা উত্তমের পর আর কি আছে তাহা ভাবনা করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। প্রভু স্বয়ং নিজ তৃষ্ণার পানীয় রামরায়ের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন। "অন্তরে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।" প্রভু স্বয়ং সুযোগ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই ভাবনা করা যাইতেছে। নতুবা এই সকল কথা এতই গূঢ় যে, "বুঝিবে রসিকজন না বুঝিবে মূঢ়।"

প্রীতিরসের ভূমিটি এমনই অপূর্ব্ব যে, উহার আস্বাদন-মাধুর্য্যে কেবল যে ভক্তই আত্মহারা তাহা নহে, ভগবানও ভক্তের মাধুর্য্য-সাগরে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। এই আত্মহারা অবস্থাটি ভক্ত ভগবানে সমভাবে চরমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সখ্যরসে সখা কৃষ্ণকে নিজের সমান মনে করে। ছোট মনে করিতে পারে না। কৃষ্ণ কোনও অন্যায় করিতে পারে, কোনও ভুল করিতে পারে এমন ভাবনা সখাদের মনে আসে না। কৃষ্ণকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, উপদেশ দেওয়া দরকার, অন্যায় কর্ম্ম করণ হেতু শাসন করা আবশ্যক, এইরূপ

চিন্তা সখ্যরসের প্রিয়গণের হৃদয়ে কুত্রাপি জাগরিত হয় না। এই সকল ভাব-সম্পদ বাৎসল্যরসের রত্নপেটিকাতে সংরক্ষিত।

শুদ্ধ বাৎসল্যরসে নিমজ্জিত নন্দরাজ ও যশোদা জগৎ-পালককে বালক মনে করেন। ভূমাকে ক্ষুদ্র মনে করেন, স্বয়ম্ভূকে ঔরসজাত পুত্র মনে করেন। অনাবিল গুণের খনিকে বহুবিধ দোষ ত্রুটির জন্য তাড়ন, ভর্ৎসন এমন কি রজ্জু দ্বারা উতুখলে বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। যথাকালে উপযুক্তরূপে শাসিত না হইলে, গোপাল পরিণত বয়সে অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিবে, সুতরাং আমি জননী, তাহাকে শাসন করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য এই ভাবনাই জননীকে কৃষ্ণশাসনে উদ্যোগী করে। এই অধিকার সখ্যরসের ভক্তের নাই।

যেমন আবেশ জনক-জননীর, ঠিক তেমন আবেশ বালক-গোপালের। বাৎসল্যরসের মহাবিষ্টতায় ভগবান আপন ভগবত্ত্ব হারা হইয়া বালকরূপে লীলাস্বাদন করেন। নিজকৃত অন্যায়ের জন্য লজ্জিত, শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হন। শাসন ভর্ৎসন এড়াইবার জন্য কখনও মিথ্যা ভাষণ করেন, কখনও বা দ্রুত-পলায়ন-পর হন। এইরূপে ভগবানের আপনহারা ভাবটি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় বাৎসল্যরসের উদ্বেলিত সাগরে।

অনন্তকোটী ব্রহ্মার শিরস্থিত মুকুটের মণিকিরণে নিয়ত উদ্ভাসিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ। সেই শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠের পথে গোপরাজ নন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার পাদুকা-শিরে ধরিয়া ছুটিতে থাকেন। এই বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্য দর্শনে স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা হয়—অহো! নন্দরাজের কি ভাগ্য!

শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন। মায়ের ভর্ৎসনার ভয়ে তাহা গোপন করিতে চাহেন। শেষে মুখবিবরে বিশ্বজগৎ প্রকট করিয়া জননীকে দেখান। পরে মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিয়া স্তন্য পান করেন। মাতৃস্তন্য হইতে অফুরন্ত ক্ষীরধারা ক্ষরণ হইতে থাকে। গোপালের মুখবিবরে দুগ্ধের স্থান সঙ্কুলন হয় না। গণ্ড বহিয়া পড়ে। মাতা বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দেন। যে মুখ-গহ্বরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থান হইল, সেখানে স্তনদুগ্ধের স্থান হয় না। এই নিরুপম মাধুর্য্য দর্শনে মনে স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা জাগে, অহো! হরি যাঁর স্তন্য পান করিয়াছেন, সেই যশোদা-জননীর কি অনির্ব্বচনীয় ভাগ্য!

গোপাল ক্রোধ করিয়া জননীর দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন। অন্যায়ের শাস্তি দিবার জন্য জননী বন্ধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অনেকবার অক্ষম হইলেন, শেষে কৃপায় সক্ষম হইলেন। নিজ কেশ বন্ধনের দুই গাছি পট্টডোরী দ্বারা গোপালের কটি বেষ্টন করিয়াছেন এবং কটিবদ্ধ বালককে উদূখলের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তৎকালীন নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া শ্রীশুকদেব মন্তব্য করিতেছেন, মাতা আজ মুক্তিদাতাকে বন্ধন করিয়াছেন। এই ভাগ্য সংসারে আর কেহ পায় নাই।

বাৎসল্য-প্রেমের মধুরিমা শ্রবণে মহাপ্রভু পরমানন্দে মধুসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। উৎফুল্ল বদনে কহিলেন, রায়, "এহোত্তম"। যে প্রেমে মুক্তিদাতা বন্ধন গ্রহণ করেন, সেই প্রেমই সাধ্যসার। পরিপূর্ণ সম্মতি জানাইয়াও অতঃপর

আরও গূঢ়তম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার বাসনায় কহিলেন, "আগে কহ আর।"

প্রভুর মধুর দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অন্তরের লালসাটি ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইয়া রামরায় কহিলেন, "কান্তাপ্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।" এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তর ভাবে স্থাপন করিবার জন্য ব্রজদর্শনে প্রেমাপ্লুতচিত্ত উদ্ধব মহাশয়ের কণ্ঠোক্তি একটি ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥

শ্লোকে শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজসুন্দরীগণের পরমোৎকর্ষ বর্ণনা করিতেছেন। ব্রজাঙ্গনাগণের যে-জাতীয় আস্বাদন রাসোৎসবে প্রকট হইয়াছিল তাহা ভাষার অতীত। অন্য কাহারও পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবেই অলভ্য। স্বর্ণকমলের মত অঙ্গকান্তি-বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও ঐ জাতীয় আস্বাদন হয় নাই। অন্য কাহারও তো হয়-ই নাই।

লক্ষ্মীদেবী যদিও শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলে সর্ব্বদা বিরাজ করেন তথাপি ব্রজাঙ্গনাগণের মত আস্বাদনের চমৎকারিতা তাঁহাতে দৃষ্ট হয় না। পিপাসাহীন ব্যক্তি সরসী-সমীপে সর্ব্বদা বসিয়া থাকিলেই যে অধিক জল পান করিতে পাইবে এমন কোন কথা নয়। যাহার যেরূপ পিপাসা যে সেইরূপ আস্বাদন করিবে। পিপাসার ন্যূনাধিক্যেই আস্বাদনের

নূনাধিক্য। লক্ষ্মীতে ব্রজগোপীকার মত প্রেমময়ী আকুল পিপাসা দৃষ্ট হয় না।

লক্ষ্মীর প্রেমে শ্রীনারায়ণের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি থাকায় তাহা সংকোচপূর্ণ। গোপীকার শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর-বুদ্ধি না থাকায় তাঁহাদের ভাব বিশুদ্ধ ও সংকোচশূন্য। শ্রীলক্ষ্মীর নারায়ণে তদীয়তা বুদ্ধি। শ্রীনারায়ণের বহু সেবিকার মধ্যে আমি একজন এই বুদ্ধিতে প্রীতি দুর্ব্বল। ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তা বুদ্ধি থাকায়, শ্রীকৃষ্ণ আমারই, এই অনুভব প্রীতিকে পরম শক্তিশালী করে।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের অপেক্ষা করেন। গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা করেন না, বরং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের অপেক্ষা করেন। সেই উদ্দেশ্যেই উদ্ধব "অস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ" কথাটি বলিয়াছেন। কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণই ব্রজাঙ্গনাগণের কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমের প্রবল স্রোত-বেগে ভাসিয়া না যান, এই জন্যই যেন তাঁহাদের কণ্ঠদেশকে অবলম্বন করিয়া রাসরসে হাবুড়ুবু খাইতেছেন।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—

রাসলীলা জয়ত্যেষা জগদেকমনোহরা।
যস্যাং শ্রীব্রজদেবীনাং শ্রীতোঽপি মহিমাস্ফুটঃ॥

জগতের একমাত্র মনোহারিণী শ্রীরাসলীলার জয় হউক। যে রাসলীলায় লক্ষ্মীদেবী হইতে ব্রজদেবীর মাহাত্ম্য অধিকরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল।

এই কান্তাপ্রেমকে মহাপ্রভু "সাধ্যাবধি" বলিয়াছেন। যদিচ সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেম তিন-ই উত্তম, তথাপি কান্তারতি সাধ্যের অবধি। ইহার কারণ বলিয়াছেন— "পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।"

শান্তরসের তুইটি গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণ ভিন্ন তৃষ্ণা ত্যাগ। দাস্যরসের এই তুইটি গুণ তো আছেই, অধিকন্তু আছে সেবানিষ্ঠা, যাহা শান্ত ভক্তে নাই। সখ্যরসে দাস্যের তিনটি গুণ তো আছেই, অধিকন্তু আছে অসংকোচে অভিন্ন-মননে সেবা, যাহা দাস্যে সম্ভব হয় না। বাৎসল্য রসে সখ্যরসের চারিটি গুণ তো আছেই, অধিকন্তু আছে মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন, যাহা সখ্যরসে সম্ভবে না। কান্তারতিতে বাৎসল্যের পাঁচটি গুণ তো আছেই, অধিকন্তু আছে নিজাঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা, যাহা বাৎসল্যে প্রকট হইতে পারে না। এই হেতুই কান্তাপ্রেম সাধ্যের অবধি।

সাধ্য শব্দের অর্থ বিচারে প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে সমগ্র জীবনের চরমতম লক্ষ্যটিই সাধ্য—মহাপ্রভু তাহারই নির্ণয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এতক্ষণে তাহা বলা হইল। স্বধর্ম্ম পালন, কর্ম্মার্পণ, ধর্ম্মার্পণ ও জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি এই চারিটি কক্ষাকে বলিয়াছেন "বাহ্য।" জ্ঞানশূন্যা-ভক্তি, প্রেমভক্তি ও দাস্য-প্রেম এই তিনকে বলিয়াছেন "হয়।" সখ্য-প্রেম ও বাৎসল্য-প্রেমকে বলিয়াছেন "উত্তম।", কান্তা-প্রেমকে বলিয়াছেন "অবধি।" প্রভু কহে "এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।"

চার, তিন, তুই, এক এই দশটি ভূমি। ক্রমোর্দ্ধভাবে যেন

দোলমঞ্চের মত সাজান। ভিত্তিতে চারিটি; শিখরে একটি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমির পর পর ভূমিকায় সার্থকতা। পূর্ব্ববর্ত্তী নয়টি স্তরের যাহা শাশ্বত মাধুর্য্য, তাহা দশম বা শিখর ভূমিস্থিত "অবধি"তে পরিণতি প্রাপ্ত। পরিপক্ক ফলে যেমন বৃক্ষের শিকড় কাণ্ড, শাখা-পত্রের সার্থকতা—সাধ্যাবধি কান্তাপ্রেমে সেইরূপ কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান-ভক্তি ও পরাভক্তির পরম চরিতার্থতা।

সর্ব্বপ্রকার সাধন মার্গের লক্ষ্য আত্মোপলব্ধি—আত্ম-স্বরূপে স্থিতি। গৌরগত বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলেন যে, কেবল জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ লইয়া যুগযুগ চেষ্টা করিলেও আত্মোপলব্ধি বা স্বরূপে স্থিতি লাভ হয় না। একমাত্র শুদ্ধ প্রেমভক্তি পথে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণেই আত্মোপলব্ধি পূর্ণতা লাভ করে। আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-সেবার্থে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলাইয়া দিয়াই স্বরূপে স্থিত হইতে হইবে। অথবা, স্বরূপে স্থিত হইলেই সেবায় সমর্পণ পূর্ণাঙ্গ হইবে। দুই একই কথা।

আত্মসমর্পণ পরমাত্মার সমীপেই সম্ভব। অংশের কাছে অংশতঃ সমর্পণ হইতে পারে। পূর্ণাঙ্গ সমর্পণ একমাত্র পূর্ণতম বিগ্রহ লীলাপুরুষোত্তমের নিকট সম্ভব হইতে পারে। অতএব সর্ব্বতোভাবে আত্মদানের পাত্রটি একমাত্র ব্রজরাজনন্দন ছাড়া আর কেহ হইতে পারেন না।

যেমন লৌকিকে একই নারী পুত্রকে বাৎসল্যে ভালবাসে, সখীকে সখ্যরসে ভালবাসে, স্বামীকে কান্তাপ্রেমে ভালবাসে। তিন স্থানে তার জীবনের তিনটি অংশ ব্যক্ত হয়। কোথাও

মাতা, কোথাও সখী কোথাও পত্নী। মাতৃত্ব, সখীত্ব, পত্নীত্ব এক অখণ্ড নারীত্বের তিনটা দিক মাত্র। এই তিনের কোন স্থানেই সে আপনার সমগ্র সত্তার অনুভব করিতে পারে না। ঐরূপ করিতে হইলে এমন একটি প্রীতির পাত্র প্রয়োজন, যিনি পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতা সখা সখী স্বামী, যা কিছু সর্ব্বস্ব-রূপে স্থিত। ঐরূপ একটি সর্ব্বরসের পাত্র মিলিলে তথায় আত্ম-বিসর্জ্জনে সামগ্রীক ভাবে অখণ্ড আত্মোপলব্ধি হইতে পারে।

কিন্তু ঐরূপ একটি পাত্র বিশ্ব-জগতে কোথাও নাই। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অখিল-রসের অমৃতঘন-বিগ্রহ আর দ্বিতীয়টি নাই। সম্পূর্ণ ভাবে পূর্ণ প্রেমে আত্মদানের একমাত্র পাত্র তিনিই। আবার প্রত্যেক রসেই আত্মনিবেদন আংশিক। একমাত্র কান্তা-প্রেমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল রসের গুণ অচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান থাকায়—ঐ রসেই সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মদান সম্ভব। সুতরাং কান্তা-প্রেমে গোপীকান্ত কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীণ সেবায় অখণ্ড আত্মোৎসর্গেই সাধ্যের অবধি অভিব্যক্ত।

আমার আমিত্ব পূর্ণাঙ্গ ভাবে কৃষ্ণে সমর্পণে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণময় হইয়া যায়। তখন আমিই আর থাকে না, কৃষ্ণই থাকেন। আবার কৃষ্ণের সুখ-বিধানের জন্য আমি তখন পূর্ণভাবেই বিদ্যমান থাকি। এইরূপে আমার সত্তার সম্পূর্ণ লোপ ও সম্পূর্ণ স্থিতি একই কালে সম্ভব হয়। এই আপাত-বিরোধী দার্শনিক তত্ত্বই গৌরপার্ষদগণের দান অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের অন্তস্তলে নিহিত।

কান্তা-প্রেমকে সাধ্যাবধি বলিয়া মহাপ্রভু আরও "আগে" শুনিতে চাহিলেন।

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।"

"অবধি"র পর আরও "আগে" শুনিতে চাওয়ার আকূতি কেন ?

[আট]

সাধ্যতত্ত্ব

[ঘ]

শ্রীরামানন্দ মুখে সাধ্যের অবধি শোনা হইল। মহাপ্রভুর আকূতি তখনও মিটিতেছে না। আরও "আগে" শুনিবার জন্য আকুল আগ্রহে প্রার্থনার ভাষায় কহিতেছেন—"কৃপা করি কহ।"

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥

সুনিশ্চিত "অবধি"র পর গৌরসুন্দর আর কি শুনিতে এত বিনয় করিতেছেন, রায় মহাশয় তাহা বুঝিতেছেন না। এই কথার পর আর প্রশ্ন চলে ইহাও তাঁহার চিন্তার অতীত।

রামরায় স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া ফেলিলেন, প্রভু, সাধ্যের যে অবধির কথা বলা হইয়াছে—তারপর আরও শুনিতে চায় এমন কোন ব্যক্তি সংসারে আছে, ইহাও কদাপি শুনি নাই। আজ আপনার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিলাম। আর কিছু বলিতে জানি না।

বলিতে পারিব না বলিয়াও রায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরহরির অন্তঃপ্রেরণাতেই ইহা সম্ভব হইল। রায় নিজেও বলিয়াছেন, "মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।" "হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।" সর্ব্বজীবহৃদ্‌বিহারী গৌরহরি রায়ের অন্তস্তলে নূতন প্রেরণা দিলেন। রায় কহিলেন—

ইহার মধ্যে রাধাপ্রেম সাধ্য-শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

"অবধি"র পর "শিরোমণি" বলিতেছেন। কথাটি বুঝিতে হইবে। সাধ্যের অবধি কান্তাভাব। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণদয়িত জানিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতে আত্মদান হইয়া থাকে। ইহাতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল ভূমিকাগুলি চরম চরিতার্থতা লাভ করে।

কান্তাভাব প্রধানতঃ দ্বিবিধ। স্বকীয়া কান্তা ও পরকীয়া কান্তা। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের ও দ্বারকার মহিষীগণের স্বকীয়া কান্তাভাব। এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ নাই। কারণ স্বকীয়া কান্তায় পূর্ব্বরাগ মান প্রভৃতি না থাকায় রস উৎকর্ষ লাভ

করে না। আচার্য্যেরা বলেন, স্বকীয়া প্রীতিতে রস হয় কিন্তু রসের নির্য্যাস আস্বাদিত হয় না।

ব্রজে ব্রজদেবীগণের পরকীয়া কান্তাভাব। পুরুষোত্তমে পর-পুরুষ-বুদ্ধি। এই ভাবনাতেই রসের নির্য্যাস আস্বাদিত হয়। সংসার-বদ্ধ জীবেরও ঐ ভাব পরম অবলম্বনীয়। বদ্ধ জীবের সংসার-অভিমন্যুতে আপন বুদ্ধি। যিনি প্রকৃত আপন সেই শ্রীগোবিন্দে পরবুদ্ধি। ব্রজবাসীজনের ঐ অবস্থা যোগ-মায়ার প্রভাবে, জগদ্বাসী জীবের ঐ অবস্থা মহামায়ার প্রভাবে। বাহ্যিক রূপ একই। সুতরাং মহামায়ার বিষয়সম্ভোগের রাজ্য ছাড়িয়া যোগমায়ার কৃষ্ণসম্ভোগের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে গোপী-পদাঙ্ক আশ্রয়ণীয়।

শ্রীগৌরহরি সনাতন গোস্বামিপাদকে বেদান্ত পঞ্চদশীর একটি শ্লোক প্রমাণ দিয়া ঐরূপ ভজনের উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্লোকটি এই—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্ত র্নবসঙ্গরসায়নম্॥

পরপুরুষাসক্তা নারী যেমন সংসারের সকল কর্ত্তব্যগুলি করে কিন্তু মন থাকে তার প্রিয়-পুরুষের দিকে, সেই প্রকার গৃহীভক্ত সংসারের সকল কর্ত্তব্যগুলি সুষ্ঠু সমাধান করিবে কিন্তু মনপ্রাণ ফেলিয়া রাখিবে শ্রীগোবিন্দের চরণপঙ্কজে। ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ এরূপ দৃষ্টান্ত আর হয় না।

অতএব পরকীয়া কান্তাভাবের পাত্রী ব্রজদেবীগণের আদর্শই মহাপ্রভুর হার্দ্দ। তবে ব্রজদেবীগণের ভাব সাধ্যের অবধি

হইলেও, ক্রমপরিণত রস-প্রবাহের চরম অবধি ব্রজদেবীগণে প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের যিনি মুখ্যা তাঁহাতেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ব্রজদেবীগণে এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

প্রেম বর্দ্ধিত হইয়া গাঢ়তা গাঢ়তমতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ও ভাব এই ছয় কক্ষা পার হইয়া মহাভাব-ভূমিতে স্থিত হয়। ঘৃত যেমন দুগ্ধের চরম পরিণতি, মহাভাব সেই প্রকার প্রেমের চরম অভিব্যক্তি। অন্যান্য ব্রজদেবীগণের কৃষ্ণানুরাগ এই শেষ অভিব্যক্তি বা অবধি-ভূমিতে পৌঁছে না। একমাত্র শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রীতিই পরম অবধিতে অধিরূঢ় হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ও "মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য তুলিয়া রাধাভাব যে সাধ্যশিরোমণি ইহা স্থাপন করিলেন। বস্তুতঃ, কান্তাভাব সাধ্যসার কথাটিতে নির্দ্দেশটা সামান্যভাবে হইয়াছিল—এইবার বিশেষ নির্দ্দেশ হইল। প্রকৃতপক্ষে কান্তাভাবের মূল লতা শ্রীরাধাই, সখীগণ তাঁহার পল্লবপুষ্পপত্র-স্থানীয়া মাত্র। শাখা-পত্রের উল্লেখে যাহা অস্পষ্ট ছিল, মুখ্য-লতার নির্দ্দেশে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া গেল।

সাধ্য-শিরোমণির কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর আনন্দের পরিসীমা নাই। তথাপি কিছু গূঢ় মাধুর্য্য শ্রবণ লালসার ছল করিয়া একটি পূর্ব্বপক্ষ বিস্তার করিলেন। এ পর্য্যন্ত প্রভু

রায়ের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া গভীরতর সংবাদ শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এবার প্রভু রায়ের সিদ্ধান্তকে না মানিয়া তর্ক তুলিলেন। প্রভু যেন অবিশ্বাসী, বিরুদ্ধবাদী সাজিলেন।

প্রভু কহিলেন, রামরায়, রাধাপ্রেমা যে সাধ্য-শিরোমণি বলিয়াছ, তাহা ত মানিতে পারিতেছি না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"—যে যৈছে ভজে, তারে ভজি তৈছে। এই বাক্যানুসারে ভক্ত ভগবানের প্রেমের পরিমাপ সমান থাকিবে। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি যদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধা প্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে।

যার প্রতি প্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকে আদর প্রদর্শন করিতে অন্যে কি ভাবিল, এই চিন্তার অবকাশ থাকিবে না। অন্যাপেক্ষায় অবকাশ থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা বা সর্ব্বাধিকতা অসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িবে। ভাগবত শাস্ত্রে দেখা যায়—রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন অন্য গোপীগণ পাছে কিছু মনে করে, এই আশঙ্কায় সকলের সমক্ষে শ্রীরাধাকে লইয়া চলিয়া না গিয়া চুরি করিয়া লইয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই "অন্যাপেক্ষা"য় রাধার প্রতি তাঁহার প্রীতি যে সর্ব্বাধিক ইহা অপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের রাধা প্রীতি যদি সর্ব্বাধিক না হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধাও কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বাতিশায়ী হইতে পারে না। সুতরাং "রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি" সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতে পারে না।

বাধা পাইলে স্রোতের বেগ যেমন বাড়িয়া উঠে, প্রভু গৌরসুন্দরের পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির বাধায় শ্রীরামরায়ও যেন একটু ফুলিয়া উঠিলেন। রায় কহিলেন, "তবে শুন" রাধা-প্রেমের মধুরিমার কথা শুন। "ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা।" প্রভু বলিয়াছেন—যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীকার ভয়ে তাহাদের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন, জ্ঞাতসারে সাক্ষাতে নিতে পারেন নাই।—এই কাহিনীটা যে ঠিক বর্ণিত হয় নাই, রামরায় তাহাই প্রমাণ করিতে বসিলেন।

শ্রীরামানন্দ বলিলেন, প্রভু, রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া পলায়ন করেন নাই। শ্রীরাধা আগে রাস-মণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধা মানিনী হইয়াই ঐরূপ করিয়াছেন। শ্রীরাধা হইলেন বামা-নায়িকা, কারণে অকারণে মান তাঁর লাগিয়াই থাকে। ঐ সময় একটা কারণও উপস্থিত হইয়াছিল।

কারণটি এই, রাস-রজনীতে প্রত্যেকটি গোপীকার পার্শ্বেই এক একটি সম্ভোগ-রস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। অন্যান্য দিন এরূপ বিলাস হয় না। অন্যান্য সময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর মিলন সুখ আস্বাদন করেন, গোপীকারা সেই আস্বাদনের আস্বাদন করেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের যে আনন্দরস সম্ভোগ—ব্রজদেবীরা সেই সম্ভোগের ভোক্তা বা সহায়ক। কিন্তু রাস-রজনীর অভিনবত্ব হইল এই যে, সেদিন প্রত্যেকেই স্বাধীন ভাবে সাধ মিটাইয়া প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিতে-ছিলেন।

প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণ আছেন। শ্রীরাধার পার্শ্বেও একমূর্ত্তি আছেন। সাধারণ প্রেমের "সর্ব্বত্র সমতা" হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধার যে অসামান্যতা তাহা থাকে নাই। শ্রীরাধাপ্রেমের যে অনন্যসাধারণতা তাহা পরিব্যক্ত রহে নাই। তাই রাধার "কুটিল" প্রেম "বামতা" প্রাপ্ত হইল। প্রেম, সর্প ও নদী ইহাদের গতি স্বাভাবিক ভাবেই বক্র। তাহাতেই শ্রীরাধা স্বরূপত বামা-নায়িকা (দক্ষিণা নহেন)—অকারণেও মানময়ী থাকেন। একে বামা-নায়িকার কুটিল প্রেম, তাহাতে ঐরূপ "সর্ব্বত্র সমতা"-রূপ বিরাট কারণ সমুপস্থিত। সুতরাং শ্রীরাধা মানিনী হইয়া রাসৌলি ছাড়িয়া গেলেন।

শ্রীরাধার মানের কথাটি আর একটু স্পষ্ট করা যাইতেছে। মহাভাব ভূমিকায় প্রেম খুব সূক্ষ্ম অবস্থায় পোঁছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধার চিত্তের একতানতা নিবিড় ও নিস্পন্দ হয়। একাগ্রতার চরমতায় চিত্ত একটি বস্তু ভিন্ন দুইটি বস্তু গ্রহণে অক্ষম হয়। শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ জগজনবল্লভ—এই দুইটি তথ্যে শ্রীরাধার একটি মনের প্রবেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। "শ্রীকৃষ্ণ আমার" ইহা ছাড়া আর কিছু জানা বা ভাবা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং মদীয়তা বুদ্ধির চরমোৎ-কর্ষে এই মানের উদয়। এই মান রসের আধার, মাধুর্য্যের ধূর্য্য।

মানিনী মানবতী হইয়া রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া যান। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনুসন্ধান

করিবার জন্য রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া গমন করেন। সুতরাং গোপীদের আশঙ্কা শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন ইহা প্রকৃত তথ্য নহে। সুতরাং অ-প্রকৃত কাহিনী অবলম্বনে প্রভু ছল করিয়া যে তর্ক তুলিয়াছেন, তাহা দাঁড়াইতে পারে না।

প্রভুর বর্ণিত কাহিনী যথার্থ নহে, রামরায়ের বর্ণিত লীলাই যথাযথ ইহাই প্রমাণ সাপেক্ষ। অর্থাৎ রামরায়ের এখন শাস্ত্র দৃষ্টে প্রমাণ করা প্রয়োজন যে, তিনি রাস-রজনীর যে বর্ণনা দিলেন তাহাই প্রকৃত কথা, প্রভু ছলনা করিয়া যাহা কহিয়াছেন তাহা অযথার্থ। রায় মহাশয় শাস্ত্র বাক্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিশেষ করিয়া রাসাদিলীলা সম্বন্ধে শ্রীভাগবতই "প্রমাণমমলং"। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন— "মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ।" শ্রীল রামরায়ও প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ ও গীতার শ্লোক তুলিয়াছেন কিন্তু জ্ঞানশূন্যা ভক্তির স্তর হইতে এ পর্য্যন্ত ভাগবত শাস্ত্রকেই সার করিয়াছেন। কিন্তু এই চরম আলোচনায় ভাগবতীয় প্রমাণ তুলিলেন না। ইহার কারণ কি?

শ্রীশ্রীপ্রভু যে ছলটি তুলিয়াছেন, আপাত দৃষ্টিতে শ্রীভাগবতই তাহার ভিত্তি। শ্রীশুকের রাস বর্ণনায়—শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন এই কথাই সুস্পষ্ট। শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া কিংবা শ্রীরাধার অনুসন্ধানে, কোন কথাই স্পষ্ট নহে। শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিতে করিতে গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্নের পার্শ্বে অন্য এক গোপীর চরণ চিহ্নও দেখিলেন এবং

পথে ক্রীড়া-বিলাসের চিহ্নাদি দেখিয়া উক্ত সঙ্গিনী গোপীই কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আরাধিকা ইহা স্থির করিলেন।

অবশেষে তাঁহারা সেই প্রধানা গোপীকাকে বিরহিনী অবস্থায় দর্শন করেন। তাঁহার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া, কি ভাবে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন, তাহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন এইরূপ অনুমিতি হয়। বস্তুতঃ ইহা শ্রীগ্রন্থের বাহ্যার্থ। এই বাহ্যার্থ অবলম্বনে মহাপ্রভুর প্রশ্ন বা ছল। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিয়া মর্ম্মার্থ গ্রহণে চেষ্টাপর হইলে দেখা যায় যে, মানের কথা ও মান প্রসাদনের কথা শ্রীশুকোক্তির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। শ্রীগ্রন্থে রাসে অন্তর্দ্ধানের শ্লোকটি এই—

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষমানঞ্চ কেশব।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

তাহাদের (গোপীদের) ও তাঁর (শ্রীরাধার) সৌভাগ্য-জনিত মদ ও মান দর্শন করিয়া কেশব গর্ব্বকে প্রশমন ও মানকে প্রসাদন করিবার জন্য অন্তর্হিত হইলেন।

দেখা যাইতেছে, "মানঞ্চ" ও "প্রসাদায়" এই শব্দদ্বয়ের অন্তরালে একটী রহস্য লুকাইয়া রাখিয়া শ্রীশুক রাসের বর্ণনা করিয়াছেন। আপাত অর্থের উপর ভিত্তি রাখিয়া মহাপ্রভু যে ছল পাতিয়াছেন, তাহা ভেদ করিতে হইলে ঐ শব্দদ্বয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য আলোচনার বিষয় করিতে হয়। শ্রীরামরায় সেই জটিল পথ ত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ তিনি শ্রীশুকের

বর্ণনার সাহায্য না লইয়া শ্রীজয়দেবের আস্বাদনের অনুসরণ করিলেন।

শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ মহাপ্রভুর পরম আদরের গ্রন্থ। ভাগবতে শ্রীশুক শারদ-রাসের বর্ণনা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দে শ্রীজয়দেব বসন্ত-রাসের আস্বাদন দিয়াছেন। রাসের মধ্যে অন্তর্দ্ধানের আড়ালে যে মানের ব্যাপারটি তাহা শুকদেব অতি সংগোপন রাখিয়াছেন, জয়দেব উহাই প্রধান ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ মান, মান-বিরহ, মিলনের চেষ্টা, মানভঞ্জন লইয়াই গীতগোবিন্দের মুখ্যাংশ গঠিত। সুতরাং ঐ সূক্ষ্ম তত্ত্বের সমাধানে জয়দেবের আশ্রয় লওয়া শ্রীরামরায়ের পক্ষে পরম বিজ্ঞোচিতই হইয়াছে।

জয়দের শ্রীরাধার মানের কারণটি স্পষ্টতর করিয়াছেন। প্রত্যেক গোপীকার পার্শ্বেই এক কৃষ্ণ আছেন। শ্রীরাধা দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ অপর গোপী সঙ্গে নৃত্য গীত করিতেছেন। শ্যাম অঙ্গে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া অন্য গোপী ভ্রমে যিনি মানবতী হন, ঐ দৃশ্য দর্শনে তাঁহার মানোদয় স্বাভাবিক। তারপর তিনি নিজের পার্শ্বে চাহিয়া দেখেন সেখানে কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা আগে দেখেন নাই। শ্রীরাধা মনে করিলেন অন্যের সঙ্গে আনন্দ-নৃত্য-গীত করিয়া, এতক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আমার কাছে আসিলেন—এই কথা ভাবিতেই খণ্ডিতা নায়িকার ভাবে ক্রমে দুর্জ্জয় মানবতী হইলেন। রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥

এই কথা বলিয়া রামরায় জয়দেবের দুইটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। উচ্চারণ করিয়া কহিলেন—এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচার করিলে "অমৃতের খনি" উঠিবে। গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকদ্বয় এই—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকাং
অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥

এই শ্লোক দুইটির মধ্যে রসতত্ত্বের কয়েকটি রত্ন লুক্কায়িত আছে। এইজন্যই রামরায় "অমৃতের খনি" কহিয়াছেন। কৃপার আলো লইয়া আমরা সে খনির মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা পাইব।

প্রথমতঃ, শ্রীরাধার একটি বিশেষণ আছে—"সংসার-বাসনাবন্ধশৃঙ্খলাং।" শ্রীকৃষ্ণের নাম আছে "কংসারি।" কংস শব্দের একটি অর্থ হইল ভোগ বাসনা। তাহার যিনি অরি। যাঁহার স্মরণে সকল ভোগ বাসনা দূরীভূত হয়—সেই শ্রীকৃষ্ণেরও একটি "সম্যকসার বাসনা" আছে। সেটি হইল রাসলীলা। ইহা বাসনা-ধ্বংসকারীর অপূর্ব্ব বাসনা।

সেই রাসলীলা বাসনাতে একটি শৃঙ্খলা। সেটি হইলেন—রাধা। শ্রীরাধা দ্বারাই রাসলীলা শৃঙ্খলিত। আমরা পূর্ব্বে

বলিয়াছি রাসলীলায় প্রত্যেক গোপীকাই স্বাধীন ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছে। এই কথা ঠিক বলা হয় নাই। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে একমাত্র শ্রীরাধার অন্তর্দ্ধানেই রাসমণ্ডলী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে কেন ?

বস্তুতঃ রাসের তত্ত্বকথাটি হইতেছে এই যে, সেদিন শ্রীরাধার কৃপায় সকল গোপীই রাধাতুল্যা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধানে অধিকারিণী হইয়াছিলেন। শ্রীরাধার কৃপা-সূত্রই মূল হেতু। কতকগুলি ফুল যে সুসংবদ্ধ হইয়া মাল্যাকারে কণ্ঠে দোলে—অন্তরালে সূত্রটিই তাহার মূল কারণ। ফুল স্বাধীন ভাবে কণ্ঠে দুলে না, সূত্রই তাহাকে কণ্ঠে দুলিবার শক্তি দেয়। সূত্রটি ছিন্ন হইলে ফুলগুলি কণ্ঠচ্যুত হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। সেই শৃঙ্খলা-রূপিণী রাধা-সূত্রের অন্তর্দ্ধানেই সমগ্র রাসলীলা বিপর্য্যস্ত। ইহাতেই বোঝা যাইতেছে —শ্রীরাধা সকল গোপীর শিরোমণি।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অনুসন্ধান করিতেছেন। যিনি অনুসন্ধেয় বস্তু তিনি আজ অনুসন্ধানরত। এই বৈপরীত্য অতীব আশ্চর্য্যকথা। আরও আশ্চর্য্য, অনুসন্ধান করিয়া অকৃতকার্য্য হইতেছেন। তদুপরি চরম আশ্চর্য্য, অকৃতকার্য্য হইয়া অনুতাপদগ্ধ হইতেছেন।

যিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, তিনি আজ কাহার টানে আকৃষ্ট ? সর্ব্বারাধ্য আরাধনায় নিযুক্ত ? এই আরাধনার ধন শ্রীরাধা। যিনি সর্ব্বসাধনার ধন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা তাঁহারও আরাধনার

ধন। সাধ্য ধন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারও শিরোমণি শ্রীরাধা। সাধ্য-শিরোমণি।

তৃতীয়তঃ, শ্লোকে আছে "রাধামাধায় হৃদয়ে"—শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা ক্রোধ করিয়া, মানবতী হইয়া রাস ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তৎপর বলিতেছেন, রাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিলেন—চলিলেন আবার রাধা অন্বেষিতে। যিনি নাই তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কিরূপ ? হৃদয়ে যিনি ধৃত, তার আবার অনুসন্ধান কীদৃশ ?

শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধরিয়া—একথার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে শ্রীরাধার ভাবকে হৃদয়ে ধরিয়া। হৃদয়ে রাধাভাব লইয়া ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন। বিরহে রাধাভাবময় হইয়াছেন। "বিরহে তন্ময়ং জগৎ।" হৃদয়ে রাধাভাব ধারণের আর একটি বিশেষ হেতুও আছে।

শ্রীরাধাকে খুঁজিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ খুঁজিতে জানেন না। চিরদিন সকলেই তাঁহাকে খুঁজিয়াছে, আজ নিজে খুঁজিবেন। কিন্তু কি ভাবে চরম অনুসন্ধান সম্ভব তাহা তো জানা প্রয়োজন। না জানিলে যিনি সর্ব্বাধিক পরিমাণে জানেন তাঁর কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। ভাবাঙ্গীকার এই শিক্ষার প্রয়োজনেই।

শ্রীকৃষ্ণ-অভিসারে তীব্রতা, একাগ্রতা, চিত্তের একতানতা এ সকল বিষয়ে 'শ্রীরাধার মত পূর্ণতম অভিজ্ঞতা তো আর কাহারও নাই। আজ শ্রীকৃষ্ণের অভিসার শ্রীরাধানুসন্ধানে।

কিন্তু কোথায় পাইবেন বাহিরের বেগ, আর অন্তরের আবেগ। তাই শ্রীরাধার ভাবটিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীরাধা-ভাব হৃদয়ে ধরিয়া 'হা রাধে', 'হা রাধে' বলিয়া নিয়ত অনুসন্ধানরত শ্রীকৃষ্ণই বক্তা শ্রীরামরায়ের সম্মুখে জিজ্ঞাসুরূপে উপবিষ্ট। ব্রজের অনুসন্ধানের পরমধন বিদ্যানগরে গোদাবরী তটে ধরা পড়িয়া যাইতেছেন। সাধ্য-শিরোমণি রাধাভাব অতি মধুর। সেই ভাব যখন শ্যামসুন্দর অঙ্গীকার করেন তখন মধুরতর। সেই ভাবাঙ্গীকারে যখন দেহকান্তিও বদলাইয়া যায় তখন মধুরতম। গৌরী-ভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ। গৌরীকৃত কৃষ্ণ। গৌরাঙ্গীকৃত কৃষ্ণ মধুরতম। সাধ্য-শিরোমণি।

পাছে ধরা পড়িয়া যান এই ভয়ে গৌরাঙ্গসুন্দর আলোচ্য বিষয় উপসংহারে টানিয়া আনিলেন—

"প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব রসবস্তু তত্ত্ব হইল জ্ঞানে॥"

সাধ্য-শিরোমণি রাধাভাব। রাধাভাব শ্রীরাধাতে সুন্দর। প্রাণকান্তে সুন্দরতর। ভাব-কান্তিময় প্রাণকান্তে সুন্দরতম। সাধ্যের নির্ণয় শুনিয়াও শ্রীশ্রীপ্রভুর শুনিবার সাধ মিটে নাই। শ্রীরামরায়কে কহিলেন—

"এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবারে মনে হয়।"

আর কী শুনিতে চাহেন প্রভু? শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব এই সব শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রায় বলিলেন, এ সব তো আমি কিছুই জানি না। তোমার মন আমার অন্তরকে যেমন প্রেরণা দিতেছে, আমি জিহ্বায় তাহাই উচ্চারণ করিতেছি মাত্র।

প্রভু বলিলেন, রায়, তুমি আমাকে অকারণ স্তুতি করিও না। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। অন্তরে ভক্তি নাই। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত আমাকে পাঠাইয়াছেন তোমার কাছে। তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য। তুমি মাদৃশ অযোগ্য-জনকে স্তব কর কেন? তবে কি তুমি শূদ্র, আমি ব্রাহ্মণ এই আশঙ্কায় তোমার সঙ্কোচ হইতেছে?

তবে শোন রামরায়, সংসারে তিনিই গুরুপদবাচ্য, যিনি শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা। তিনি ব্রাহ্মণ হউন, শূদ্র হউন, গৃহী হউন, তপস্বী হউন, যাই হউন না কেন। তুমি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা। সুতরাং গুরু। কৃষ্ণকথা শুনাইয়া তৃপ্তিদান কর।

রামরায় কহিলেন, প্রভু, আমার জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী। তুমি যাহা উচ্চারণ করাইতেছ, তাহাই বলিতেছি। ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই। প্রভু গৌরহরি যে স্বয়ং বস্তু, ইহা সম্যক বুঝিয়াও রামরায় সময় সময় যেন ভুলিয়া যান। সম্পূর্ণ চিনিলে প্রভুকে উপদেশ দিতে পারিতেন না। প্রভুর শুনিবার ইচ্ছা প্রবল। তাই তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে লীলাশক্তি প্রভুর তত্ত্বকে রামরায়ের চিত্তে ঢাকিয়া রাখিতেছেন। ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করিবার জন্যই ঢাকিতেছেন।

খুলিবার জন্যই ঢাকা। আহার সুষ্ঠু করাইবার জন্যই পরিবেশনের শৃঙ্খলতা ও ধীরতা।

রামরায় শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের মূল। তিনি নিখিল বিশ্বের পরম আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি সচ্চিদানন্দময়। প্রাকৃত রক্তমাংসে উহা গঠিত নহে। সকলই অপ্রাকৃত।

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন। মদন বলে তাকে, যে চিত্তে মত্ততা জন্মায়। যে জাগতিক বস্তুতে প্রলোভন জন্মায় সে প্রাকৃত মদন। আর যিনি অপ্রাকৃত বস্তুতে লালসা জন্মান তিনি অপ্রাকৃত মদন। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য নিজের প্রতি আস্বাদনের নিমিত্ত, নিজের ও ভক্তগণের অন্তরে তীব্র লালসা জাগায়, তাই তিনি অপ্রাকৃত মদন।

প্রাকৃত মদনে প্রাপ্য বস্তুর পাওয়ার পরে, তৎপ্রতি লালসা দূর হইয়া যায়। আস্বাদনেও নূতনত্ব থাকে না। আর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যত আস্বাদন করা যায় তত লালসা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। "তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে কোটী গুণ।" আস্বাদনের পরও শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য নিত্য নবায়মান। তাই তিনি নবীন মদন।

শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। নিখিল রসের তিনি বিষয় ও আশ্রয়। বিষয়রূপে আশ্রয়। যখন শ্রীদামসখা কৃষ্ণ-মুখে উচ্ছিষ্ট ফল তুলিয়া দেন তখন শ্রীকৃষ্ণ সখ্যরসের বিষয়। আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেমভরে সখার মুখে নিজোচ্ছিষ্ট তুলিয়া

দেন তখন তিনি সখ্যরসের আশ্রয় হন। এইরূপ প্রত্যেকটি রস সম্বন্ধেই সত্য।

"নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥"

সকল রসের রাজা শৃঙ্গার রস বা মধুর রস। এই রসের মধ্যে সকল রস অন্তর্লীন আছে। শ্রীকৃষ্ণ "শৃঙ্গাররসরাজ-মূর্ত্তিধর।" মধুর রসের ঘনীভূত প্রতিমা শ্রীকৃষ্ণ। রূপ-মাধুর্য্য সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক, নিজেকে পর্য্যন্ত। "অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্ব চিত্তহর।" কেবল নিজের রূপে নিজে আকৃষ্টই নহেন। নিজেকে আলিঙ্গন করিয়া আস্বাদন করিতেও নিজে সর্ব্বদা লালায়িত।

এই লালসার পূর্ণ পরিণতিই শ্রীগৌরসুন্দর। বোধ হয় এই জন্যই রামরায়ের শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব আলোচনা "আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শেষ হইয়া গেল। পাছে নিজে ধরা পড়েন, এই আশঙ্কায় বুঝি বা রামরায়ের অন্তরে প্রেরণা দিয়া আলোচনা হঠাৎ শেষ করাইয়া দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া তৎপর শ্রীরাধার স্বরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন শ্রীরামরায়। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তার মধ্যে তিনটি প্রধান। চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিৎশক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গাশক্তি বা স্বরূপশক্তি। মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গাশক্তি। জীবশক্তির অপর নাম তটস্থা-শক্তি। ইহাদের মধ্যে চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি সর্ব্বোপরি।

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় সুতরাং স্বরূপশক্তির তিন রূপ। সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী।

যে শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে-সুখাস্বাদন করান তিনি হইলেন হ্লাদিনীশক্তি। তিনি কৃষ্ণভক্তকে সুখাস্বাদন করান। হ্লাদিনীশক্তির নির্য্যাস হইল প্রেম। আনন্দের অনুভব-রূপ চিন্ময় রসেই প্রেমের প্রকাশ ও বিকাশ। প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা মহাভাব। সেই মহাভাবের মূর্ত্তি শ্রীরাধা। যে পরমা-শক্তি শৃঙ্গাররসরাজময়মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণকে ঐ রসানন্দ আস্বাদন করান তিনি শ্রীরাধা।

মহাভাবময়ী শ্রীরাধা কী কার্য্য করেন? চিন্তামণি যেমন সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করে, সেইরূপ শ্রীরাধাও রসরাজের সকল বাঞ্ছা পূর্ত্তি করেন। "কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।" একা শ্রীরাধাই যদি শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন তাহা হইলে সখীগণের আর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আবার বহু-প্রিয়া-সহ-বিলাসজাত সুখাস্বাদনে যদি কৃষ্ণের বাঞ্ছা হয় তাহা একা কি উপায়ে পূর্ণ করেন? উত্তর বলিয়াছেন, ললিতাদি সখীবৃন্দ শ্রীরাধা হইতে স্বতন্ত্র কেহ নহেন। উঁহারা তাঁহারই কায়ব্যূহ-রূপ। শ্রীরাধা স্বয়ংরূপে ও ললিতাদি কায়ব্যূহরূপে শ্রীকৃষ্ণের বহুকান্তাসহিত সঙ্গম-জনিত রসাস্বাদনের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ যশ শ্রবণই শ্রীরাধার কর্ণভূষণ। শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ যশের প্রবাহই শ্রীরাধার শ্রীমুখে মধুধারা।

"কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কানে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥"

শ্রীকৃষ্ণ কেবল রসরাজ নহেন। রসিক-শেখরও বটেন। রসিক বলে রসের আস্বাদককে। তিনি নিজেকেই নিজে আস্বাদন করেন। উহা একাকী সম্ভব নহে। ইহা করেন তিনি শ্রীরাধার মাধ্যমে। ইনি শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামরস মধু পান করান।

"কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥"

পতি সোহাগিনী সত্যভামা শ্রীরাধার সৌভাগ্য কামনা করেন। কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী ব্রজরামা শ্রীরাধার কলাবিলাস শিক্ষা করেন, সুন্দরীগণের শিরোমণি লক্ষ্মী পার্ব্বতী শ্রীরাধার ন্যায় সৌন্দর্য্য অভিলাষ করেন। পতিব্রতাগণের মুকুটমণি অরুন্ধতী শ্রীরাধার পাতিব্রত্য বাঞ্ছা করেন। শ্রীরাধার গুণ অনন্ত। ক্ষুদ্রজীব আমি আর কী বলিব। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার গুণগণের সীমা পান না। শ্রীরাধার স্বরূপ বলা এইখানে শেষ হইল।

"যাঁর সদ্‌গুণের কৃষ্ণ নাহি পান পার"—পার পান না বলিয়াই পাইতে বাঞ্ছা জাগে। বাঞ্ছা জাগিলেই রাধার ভাব অঙ্গীকারে শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়া যান। সুতরাং ঐ কথার পর আর এক পা অগ্রসর হইলেই গৌর ধরা পড়েন, বুঝি বা তাই রামরায়ের অন্তরে প্রেরণা দিয়া রাধার কথা বলা শেষ করাইলেন। শ্রীরামরায়কে শ্রীরাধার স্বরূপ কীর্ত্তনে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু কহিলেন—জানিল রাধা-

কৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব।" রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব শুনিলাম, এখন দোঁহার বিলাসমহত্ত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা।

রায় বলিলেন. কৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব হইল "নিরন্তর কামক্রীড়া।" কামক্রীড়া অর্থ প্রেমের খেলা। যিনি সর্ব্বদাই প্রেমের খেলা লইয়া থাকেন। নন্দরাজার দাস রক্তকপত্রকাদি সঙ্গে দাস্যরসের খেলা। যশোদা রোহিণী ধনিষ্ঠাদির সঙ্গে বাৎসল্যরসের খেলা। শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গলাদি সঙ্গে সখ্যরসের খেলা। শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী ললিতা শৈব্যাদি সঙ্গে মধুর রসের খেলা। সকল সময় দিবারাত্র অষ্টকালীন কোনও না কোন প্রেমের খেলা লইয়াই আছেন তিনি। ইহাই তাঁহার বিলাসমহত্ত্ব।

শ্রীশ্রীপ্রভু কহিলেন, রায়, "এহ হয়, আগে কহ আর।" রায় কহিলেন প্রভু, "ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর।" ইহার পর আর বুদ্ধিগতি নাই।

"বুদ্ধিগতি নাই" বলিয়াও আবার রামরায় শ্রীশ্রীপ্রভুর অন্তর-প্রেরণায় বলিতে লাগিলেন—প্রভু, এক প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথা বলিব। তবে তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার সুখ হইবে কি না বলিতে পারি না। এই কথা বলিয়া স্বরচিত একটি গানের পদ গাহিলেন। কতদূর গাহিতেই—

"প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।"

দুইটি কথা বুঝিবার। তোমার সুখ হয় কি না হয় একথা রামরায় বলিলেন কেন? আর প্রভু তাঁহার মুখাচ্ছাদনই বা করিলেন কেন?

প্রথমতঃ প্রভু "পড় শ্লোক" বলিয়া রামরায়কে শাস্ত্রের শ্লোক বলিতে বলিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের শ্লোকেই নিজ মতের পোষণ করিয়াছেন। এখন যেটি বলিবেন সেটি নিজকৃত গান। যিনি শাস্ত্রের প্রামাণ্য শ্লোক শুনিতে চাহেন তিনি রামরায়ের গানে সুখ পাবেন কি না বলা যায় না। বৈষ্ণবোচিত দৈন্যে রামরায় নিজের গানকে বেশী মূল্যবানও মনে করেন না। তাই ঐ কথা। দ্বিতীয়তঃ রামরায় কৃত গানটি বিরহের পদ। বিলাসের মিলনসুখের কথার পর বিরহের গান শুনিয়া প্রভুর অন্তরে বেদনা হইতে পারে। সুতরাং সুখী হন কি না হন এই আশঙ্কা।

তৃতীয়তঃ ঐ পদের মধ্যে যে একটি গভীর কথা আছে সেটির মধ্যে মহাপ্রভু প্রবেশ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন কি না এ সম্বন্ধে রামরায়ের সন্দেহ আছে। প্রভু যে স্বয়ং নন্দনন্দন এ বিশ্বাস রামরায়ের স্থিরভাবে আসে নাই। কখনও আসে, কখনও যায়। যখন যায় তখন প্রভুকে জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী ভাবেন। ব্রজের গভীর রসে জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীর প্রবেশ না থাকারই কথা তাই রামরায়ের সন্দেহ। রামরায়ের চিত্তের এই অবস্থা প্রভু ইচ্ছা করিয়াই করিয়া রাখিয়াছেন।

সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ জগদাকর্ষক। যখন ইহার বৈপরীত্য ঘটে, বিশেষ ঘটনায় জগদাকর্ষক কাহারও আকর্ষণে পড়িয়া যান তখনই বিলাসবিবর্ত্ত হয়। তিনি সকলকে টানেন বলিয়া "কৃষ্ণ" নাম সার্থক। তিনি যখন কাহারও টানে পড়িয়া যান তখনই বিবর্ত্তবিলাস হয়। আজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পূর্ণ

বশীভূত হইয়া শ্রীরাধাসমীপে দূতী পাঠাইয়াছেন। তাই পদটিতে বিবর্ত্তবিলাস মাধুর্য্য প্রকটিত।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দূতীর নিকট বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার অনুরাগ প্রথমাবধিই (পহিলহি) আছে। ইহার আরম্ভ নাই। অনাদিকালই আছে। ঐ অনুরাগ বুকে লইয়াই জন্মিয়াছি। নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলাম জন্মাবধি। শ্রীকৃষ্ণ বদন না দেখিয়া চক্ষু খুলিব না এই সংকল্প করিয়াই জন্মিয়াছিলাম ভূমিতে। শিশু কৃষ্ণ যখন প্রথম স্পর্শ দিল, তখনই নয়ন খুলিয়া চাহিলাম (নয়ন ভঙ্গ ভেল)।

সেই অনাদিসিদ্ধ অনুরাগ নয়নভঙ্গি দ্বারা প্রকটিত হইয়া বাড়িতে লাগিল। কিন্তু সীমান্তে আর পৌঁছিল না। তিনি রমণ আমি রমণী, তিনি স্বামী আমি পত্নী, কিংবা তিনি বল্লভ আমি প্রেয়সী এইরূপ কোনও সম্বন্ধ তাঁহাতে আমাতে নাই। কেবল মদন দুই জনকে এক জন করিয়া ফেলিয়াছে প্রেমের পেষণে।

এই পর্য্যন্ত বলিতে না বলিতে প্রভু স্বহস্তে বক্তার মুখ আচ্ছাদন করিয়াছেন। "ন সো রমণ ন হাম রমণী" এই কথাটিতেই প্রভু প্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছেন। পূর্ব্বাপর দেখা গিয়াছে, "কর্ম্ম" আসিয়াছে আড়ম্বরে, লয় হইয়া গিয়াছে জ্ঞানে। "জ্ঞান" আসিয়াছে অতি উদ্যমে, লয় হইয়া গিয়াছে ভক্তিতে। "সম্বন্ধজ্ঞান" আসিয়াছে ভক্তিকে পরাভক্তি করিতে। দাস্যাদি সম্বন্ধ গাঢ় গাঢ়তর হইয়া মধুরে পৌঁছিয়াছে। সেই মধুর রসের কথাই চলিতেছে—এখন চরমতম ভূমি পাইতে হইলে

সম্বন্ধজ্ঞানকেও লয় পাইতে হইবে। পতি পত্নী বা রমণ রমণী এই সম্বন্ধজ্ঞানেও প্রীতি সঙ্কুচিত থাকে। প্রেম যদি সম্বন্ধানুগ হয়, তাহা হইলে তাহা দুর্ব্বল হয়।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধানুগ নহে, তাঁহাদের সম্বন্ধ প্রেমানুগ। লৌকিকে আগে সম্বন্ধ পরে প্রেম। রাধাগোবিন্দের আগে প্রেম পরে সম্বন্ধ। প্রেম তাঁহাদের জন্মেরও পূর্ব্ব হইতে। তারপর সম্বন্ধ। প্রেমের যখন যেমন ইচ্ছা সম্বন্ধ পাতাইয়া লয়। সেই সম্বন্ধ যখন পরিপূর্ণতায় পৌঁছায় তখন কোন সম্বন্ধই থাকে না। অথবা, সকল সম্বন্ধই থাকে। দুই একই কথা।

জ্ঞানের পূর্ণতায় যেমন জ্ঞানশূন্যতা, সর্ব্ব সম্বন্ধের পরিপূর্ণতায় সেইরূপ সম্বন্ধহীনতা। সম্বন্ধের পূর্ণতা অর্থ একীভূত অবস্থা। সংসারে প্রভুভৃত্য পিতাপুত্র সখাসুহৃদ পতিপত্নী রমণরমণী যত প্রকারের সম্বন্ধ জগতে আছে, সবগুলি যদি একাধারে একীভূত হইয়া একাকার হইয়া যায় তবেই হয় সেখানে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতা বা সম্বন্ধহীনতা।

দুইয়ের সম্বন্ধকে কেহ বলেন স্বকীয়া, কেহ বলেন পরকীয়া। বস্তুতঃ ইহা স্বকীয়া পরকীয়ার মিলনীভূত এক অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। মহাভাব যেমন সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী, এই সম্বন্ধও সেইরূপ নিখিলসম্বন্ধবিলাসী। সকল সম্বন্ধ থাকা আর কোন সম্বন্ধ না-থাকা একই কথা। "ন সো রমণ ন হাম রমণী" এই পদে ঐ সর্ব্বসম্বন্ধ-শূন্যতার কথাই উদ্দিষ্ট। এই পদে মহাপ্রভু চরম সংবাদ পাইয়া আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছেন।

আনন্দে ডুবিয়া নীরব থাকিয়া নিষ্ক্রিয় রহিতেও পারিতেন। তাহা করিলেন না—স্বহস্তে মুখাচ্ছাদন ক্রিয়াটি করিলেন—কেন? ধরা পড়িবার আশঙ্কায়!—

"তুহু মন মনোভব পেষল জানি।"

তুই জনের মনকে অপ্রাকৃত প্রেম পেষণ করিয়া এক করিয়া দিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ একপ্রাণ তুই দেহ। এক-প্রাণ-তুই-দেহ পর্য্যন্ত যখন ধরা পড়িয়াছে তখন আর এক ধাপ গেলেই এক-দেহ তুই প্রাণ ধরা পড়িয়া যাইবে। শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এমন অপূর্ব্ব ভাবে মিলিত যে, তাঁহারা রমণ রমণী ভাবাতীত। তাঁহারা একদেহে মিলিত কিন্তু ভাব তুইটি, একদেহে তুইটি মনের খেলা। শ্রীরামানন্দের উক্তি যতদূর পৌঁছিয়াছে তাহাতে সম্মুখস্থ পুরুষটি প্রায় ধরা পড়িয়া গিয়াছেন—বুঝি বা তাই আনন্দে বক্তার মুখ ঢাকিয়া ধরিলেন। ইঙ্গিতে বুঝাইলেন আর বলিতে হইবে না।

"প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥"

এইরূপ কয়েকবারই ধরা পড়িতে পড়িতে এড়াইয়া গেলেন, শেষে যেভাবে ধরা পড়িয়া গেলেন, তাহা এখন বলিব। ধরা পড়িয়া গেলেন বা ধরা দিলেন তাহা এইক্ষেত্রে একই কথা।

রামরায় হঠাৎ দেখিলেন প্রভুর সন্ন্যাসীরূপ নাই। সেখানে বিরাজমান এক বংশীধারী শ্যামকিশোর ও তৎসম্মুখে এক স্বর্ণবর্ণা প্রতিমা। ঐ স্বর্ণ-প্রতিমার উজ্জ্বল গৌরকান্ত্যে শ্যামলের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। দর্শন করিয়া রামরায় বলিলেন,

প্রভু, মনে এক সংশয় আছে, কৃপা করিয়া তাহা সমাধান করিয়া দেন।

প্রথমে তোমাকে সন্ন্যাসীরূপ দেখিলাম। তারপর তোমার স্থানে শ্যামল গোপবেশধারী এক নবকিশোর দেখিলাম। তাঁহার সম্মুখভাগে এক কাঞ্চনবর্ণা পুত্তলিকা নাচিতেছে। সে তাহার গৌরকান্তির ছটা দিয়া শ্যামসুন্দরের শ্যামলশোভা আবৃত করিয়া দিতেছে। ইহার কারণ কি?

প্রভু তখন ধরা পড়িবার ভয়ে নিজেকে আবার লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, রামরায়, ওটি কিছুই নহে, তোমার চোখের দোষমাত্র। তোমার প্রবল প্রেম আছে রাধাকৃষ্ণে। তাই তুমি তোমার প্রেমচক্ষে আমার মধ্যেও তাহাই দেখিতেছ।

রায় বলিলেন, প্রভু, তুমি ভারিভুরি ছাড়। কপটতা ত্যাগ কর। আমার কাছে নিজস্বরূপ চুরি করিও না, আর আত্মগোপন করিও না। আমার মনে হয় তুমি—

"রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥"

প্রভুর কৃপায় রামরায়ের অন্তরে প্রভুর পরম তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, মনে আর সংশয় নাই। তবু প্রত্যক্ষ দেখিতে চান ও প্রভুর শ্রীমুখে শুনিতে চান।

তখন প্রভু মধুর হাসিয়া নিজ নিগূঢ় স্বরূপ রামরায়ের নিকট প্রকটিত করিলেন।

"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥"

মৃদু হাসিয়া প্রভু রায়ের বাক্যে সম্মতি জানাইয়া নিজ স্বরূপ দেখাইলেন। প্রভু দেখাইলেন শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধা একাধারে একীভূত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর রূপে প্রকটিভূত। এই অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ দর্শন করিয়া শ্রীরামানন্দ আনন্দে সম্বিদহারা হইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীহস্ত স্পর্শ করিয়া তাহাকে চেতন করিলেন। শ্রীমুখে কহিলেন—

আমার অঙ্গের এই গৌরবর্ণ টি বস্তুতঃ পক্ষে আমার বর্ণ নহে। শ্রীরাধার স্পর্শেই, তাঁহার অঙ্গের ছটাতেই আমার বর্ণের এই গৌরিমা। শ্রীরাধার অঙ্গচ্ছটা লাগিয়াছে কাহার অঙ্গে—সে কথাটি বলিতেছেন বড় মধুর ভঙ্গি করিয়া।

"গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।"

শ্রীরাধাঠাকুরাণী যাকে তাকে স্পর্শ করেন না কদাপি। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কাহারও গাত্র তিনি স্পর্শ করেন না। চাতুর্য্যপূর্ণ ভাষাতে বলা হইল যে, আমিই সেই রাধা-বিজড়িত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

জীবের চরম পরম সাধ্যবস্তু যে রাধালিঙ্গিত শ্যামকিশোর শ্রীগৌরকিশোর, এই তথ্য এইবার বিচার-যুক্তি-তর্ক, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ শব্দ প্রমাণ ও অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা সুদৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত হইল।

সাধ্যের অবধি হইল। এবার সাধনের কথা।

[নয়]

সাধন-রহস্য ও মহাপ্রভু

সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্ব পৃথক পৃথক আলোচিত হইল। পুনরায় উভয়কে একত্র করিয়া বিচার করা প্রয়োজন। এই বিচারের ফলে একটি অভিনব সাধন-রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। মহাপ্রভুর অভিনব অবদান দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রবণ কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ সাধন, একথা সাধনতত্ত্বে বলা হইয়াছে। সাধ্যের শিরোমণি রাধাপ্রেম, এ তত্ত্ব রামানন্দ সংবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাধ্য বলিতে জীবের সামগ্রীক জীবন-সাধনার চরম লক্ষ্যীভূত বস্তুটি বুঝিতে হইবে। সুতরাং রাধা-প্রেম সাধ্য-শিরোমণি এই কথার তাৎপর্য্য হইবে এই যে, জীব চরমে ঐ পরমতম সম্পদ লাভ করিতে পারিলেই জীবনসাধনার সম্পূর্ণ সার্থকতা সিদ্ধ হইবে।

জীবের স্বরূপ বলা হইয়াছে "কৃষ্ণদাস।" রসিক আচার্য্যেরা বলেন, দাস্য রস ও মধুর রসে মিলন ঘটে না। দাসের মধুর রসে অধিকার হয় না। সীতারামের মিলনসুখের লেশমাত্র অনুসন্ধানও হনুমানজীর পক্ষে সুদূরপরাহত। চরণ সেবক, আজ্ঞা পালক দাসের, মধুররসাধিকারিণীর মত সর্ব্বতোভাবে আত্মদানে সামর্থ্য কোথায় ?

সুতরাং একটি কঠিন প্রশ্নের উদয় হইতেছে। কৃষ্ণদাস জীবের সাধ্য-শিরোমণি রাধাপ্রেমাস্বাদনে অধিকার হইবে কিরূপে ? যে বস্তু যাহার অধিকারের বাহিরে, সেই বস্তু

তাহার পক্ষে সাধ্য বলিয়া গৃহীত হইবে কোন্ যুক্তি বলে? আর, শুধু শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনে অমন দুর্লভ সাধ্য মিলিবে কি করিয়া?

শ্রীগৌরপার্ষদগণ বলেন, মহাপ্রভু আসিয়াছেন সাধ্য-শিরোমণি রাধাপ্রেমধন জীব-জগতকে অকাতরে অবিচারে বিতরণ করিতে। প্রশ্ন উঠিবে, যে দ্রব্যে যাহার অধিকার নাই তৎসন্নিধানে সেই বস্তু বিতরণের সার্থকতা কোথায়? নিত্যদাস জীবের দুয়ারে মধুর রসের ভাণ্ডার খুলিবার উপযোগিতা কি? এই সকল জিজ্ঞাসার সমাধান গভীরতর বিচার-সাপেক্ষ।

প্রারম্ভে জীবের স্বরূপটি কি তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। শ্রুতিতে কোন কোন মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতার কথা আছে। (অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি) বস্তুতঃ সৎ ও চিৎ ধর্ম্ম দৃষ্টে জীব ও ব্রহ্ম একই। জলত্ব পুরস্কারে যেমন সাগরভরা জল ও এক ফোঁটা জল অভিন্ন। কিন্তু পরিমাণ-গত ভেদ বিচারে সাগর অংশী, একবিন্দু জল অংশ।

সেইরূপ আনন্দ-স্বরূপতার বিচারে ব্রহ্ম অংশী, জীব অংশ। "মমৈবাংশো জীবলোকে" ইত্যাদি বাক্যে গীতায় শ্রীমুখে উচ্চ কণ্ঠেই তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহ্ম বৃহৎ, জীব ক্ষুদ্র। ব্রহ্ম ভূমা, জীব অণু (এষঃ অণুঃ আত্মা—মুণ্ডক)। সূর্য্য আর তার কিরণকণা যেমন, অগ্নিরাশি আর একটি স্ফুলিঙ্গ যেমন। তেমনি এইখানে ভেদ।

আনন্দের ভোগাংশের দিকে দৃষ্টি করিলে আরও ভেদ আছে। তিনি আশ্রয়, জীব আশ্রিত। তিনি প্রভু, জীব

দাস। ভূমা ও অণু, অংশী ও অংশ এই ভেদ তত্ত্বগত, প্রভু ও ভৃত্য, সেব্য ও সেবক এই ভেদ রসগত। তত্ত্বের ভিত্তি হইল স্বরূপ, রসের ভিত্তি হইল সম্বন্ধ। গীতায় তত্ত্বগত ভেদের কথাই বড়। ভাগবতে রসগত ভেদের দিকেই দৃষ্টির প্রাধান্য।

ভাগবতীয়দের নিকট সংবাদ পাওয়া গেল, জীব কেবল অংশ নহে, জীব কৃষ্ণের দাস। "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।" "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" ইহাও শেষ কথা নয়। জীব কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি। সুতরাং জীব ও কৃষ্ণে ভেদ হইতেছে শক্তিতত্ত্বের মাধ্যমে। যাঁহারা ব্রহ্ম বস্তুকে নিঃশক্তিক ভাবনা করেন, তাঁহারা জীব ও ব্রহ্মে অভিন্নতা দেখিবেনই। স্বরূপাশক্তির লীলাবৈচিত্র্যময় ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণ উপাসনায় শক্তি দ্বারে জীবের সঙ্গে ভিন্নতা নিত্যই।

জীব তটস্থাশক্তি। "তটস্থত্বঞ্চ উভয়কোটৌ অপ্রবিষ্টত্বাদেব", কোন কোটিতেই তার প্রবেশ নাই। তবে সেই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে বহির্মুখী হয়, অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির করুণায় অন্তর্মুখী হয়। স্বরূপশক্তির আশ্রয়ানুগত্যেই জীবের জীবনের পূর্ণতম সার্থকতার উপলব্ধি হয়। সুতরাং অতি রহস্যময় খবরটি হইতেছে এই যে, রসতঃ বিচারে জীব কৃষ্ণদাস নহে, জীব স্বরূপাশক্তি শ্রীরাধার দাসী।

শ্রীরাধা শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্। শ্রীরাধা-শক্তিতে শক্তিমত্তাই কৃষ্ণত্ব। সুতরাং রসের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি শ্রীরাধার সঙ্গেই জীবের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও নিকটতর। রাধাদাস্য লাভেই জীবের পরম চরিতার্থতা। এই রহস্যময় নব-

বার্ত্তা শ্রীগৌরহরিই বহিয়া আনিয়াছেন। প্রিয় পার্ষদ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতির ভজনে উহা সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

জীবের রাধা-দাসীত্বের খবরটি একটি যৎসামান্য কথা মাত্র নহে। জীবের দাসত্বও থাকিবে, মধুর রসের আস্বাদনও থাকিবে, কেবল মাত্র রাধা-দাসিত্বের পরিচয় দ্বারেই ইহা সম্ভব। মধুর রস ও দাস্য রসের বিরোধিতা রাধাদাসীরাই সমাধান করিবে। এই মহাসমাধানের সন্ধান দিয়াই শ্রীগৌর-সুন্দর যারে তারে উজ্জ্বল প্রেমধন দান করিয়াছেন। সুতরাং এই স্বরূপ পরিচয়টি নিবিষ্টভাবে অনুধাবনীয়।

শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তির মূর্ত্তি। জীব তটস্থাশক্তির পক্ষে স্বরূপাশক্তির মুখ্য দাসীত্বেও অনধিকার। হ্লাদিনীর মুখ্য দাসী যাহারা, তাহারা তাঁহারই কায়ব্যূহ। কায়ব্যূহ-স্বরূপা নিত্যসিদ্ধা সখীগণই শ্রীরাধার মুখ্য দাসী। জীব সেই দাসীগণের দাসী। শ্রীরাধা-দাসীগণের দাস্যে জীবের মধুর রসের আস্বাদন কিরূপে ঘটিবে—তাহাই জানিবার জন্য গৌরহরি শ্রীরামরায়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

“প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়॥”

সখীগণের আনুগত্যময় দাসীত্বে ঐ সাধ্য লাভ হয়—এই কথাটি বলিবার উদ্দেশ্যে উত্তর দিতে গিয়া রামরায় প্রথমে

রাধাদাসীগণের কি অধিকার ও যোগ্যতা তাহা প্রপঞ্চিত করিতেছেন।

মুখবন্ধে রামরায় কহিলেন—"প্রভু, ভালমন্দ কিছু জানি না, যাহা কহাও তাহাই কহিতেছি।" প্রভুর জিজ্ঞাস্য বিষয়টি যে অতীব রহস্যময়, তাহা উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিলেন যে, এই রহস্যময় কথার বক্তা ও শ্রোতা বিশ্বসংসারে একজনই আছেন। তিনি "গৌরসুন্দর" নিজেই। তবে আমি রামরায় যে কিছু বলিতে পারিতেছি, তাহা যন্ত্রীর হস্তস্থিত যন্ত্রের মত।

"মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥"

এই সাধন-রহস্য ব্রহ্মাদি দেবগণের পক্ষে সুদুর্লভ। প্রহ্লাদাদি হরিভক্তগণের নিত্য অনুধ্যানের, এমন কি ব্রজের শ্রীদামাদি সখাগণের, নন্দ যশোদাদি জননীগণেরও অবিদিত। তথা শ্রীরায় কণ্ঠোক্তি—

"রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥"

উপরোক্ত "দাস্য বাৎসল্যাদি" ভাবের কথাটি বিশেষ সঙ্কেত-পূর্ণ। দাস্যের গোচর নহে, তৎপর বাৎসল্য বলায় মধ্যবর্ত্তী সখ্যও পাওয়া গেল। সখ্যের গোচর নহে, বাৎসল্যেরও গোচর নহে। অবশিষ্ট রহিল শুধু মধুর রস। কিন্তু পরে আবার "আদি" শব্দ কেন?

"আদি" পদের লক্ষীভূত রসটি কি? মধুর ছাড়া তো আর কেহ অবশিষ্ট নাই। আদি পদে "মধুর" রসকে গ্রহণ করিলে

ফলে দাঁড়ায় যে, রাধাকৃষ্ণ লীলা, পঞ্চ রসের সকলেরই অগোচর। সকলেরই অগোচর হইলে গোচর হইবে কাহার ?

এ যেন এক ব্যাসকূট। "আদি" পদ কেন, তাহার লক্ষ্য কি ? তাহা যেন বুদ্ধিগত হইতে চায় না। একমাত্র গৌর-কৃপাস্নাত ভক্ত ছাড়া এই সব রহস্যের অর্গল আর কে খুলিতে পারে ?

মধুর রসের দ্বিবিধ সংস্থান। স্বকীয়া মধুর ও পরকীয়া মধুর। সুরসিক রামরায় "আদি" পদ দ্বারা—স্বকীয়া মধুরকে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণলীলা স্বকীয়া মধুর রসেরও গোচরীভূত হয় না। দ্বারকার মহিষীগণের, বৈকুণ্ঠের লক্ষী-গণেরও রাধাগোবিন্দলীলা-গহনে প্রবেশের অধিকার নাই। তবে অধিকার আছে কার ? রামরায় কহিলেন—

"একমাত্র সখিগণের ইহাতে অধিকার।"

পরকীয়া-মধুররসাভিষিক্ত শ্রীরাধাদাসী সখিগণেরই ইহাতে একমাত্র অধিকার। তাহাদের যে কেবলমাত্র আস্বাদনের অধিকার তাহাই নহে, ঐ লীলাকে বিস্তার করিয়া পরিপুষ্টি সাধন করিবার যোগ্যতা সখিগণের রহিয়াছে। শ্রীরায়ের কণ্ঠোক্তি প্রভু গৌরহরি শ্রবণ করিতেছেন—

"সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥"

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতকার লিখিয়াছেন—(.০। ৭)

"বিভুরতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥"

শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাব অতি মহান। ইহা পরম সুখস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ। তথাপি সখীগণ ব্যতীত রসের পুষ্টি হয় না। সুতরাং কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি সখিগণের চরণাশ্রয় করিবে না? অর্থাৎ সকলেরই করা উচিত।

রসগোল্লাটি মুখে দিলে মুখ মিষ্টি-রসে ভরিয়া যায় ইহাতে অপরের সাহায্য লাগে না। শ্রীরাধাকৃষ্ণ অতি সুখস্বরূপ। তাঁহাদের মিলনেই পরম আনন্দের উদয়। সেই সুখের সম্ভোগের জন্য আর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। তথাপি সখিগণের এক অদ্ভুত মহিমা, তাঁহারা ছাড়া ঐ প্রেমের সুখস্বরূপতার অনুভব হইতে পারে না।

সূর্য্য স্বপ্রকাশ, তাহাকে দেখাইতে আর আলোর দরকার হয় না। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা স্বয়ং স্বপ্রকাশ। উহা সর্ব্বদা সকলের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া বিরাজমানা থাকা উচিত। কিন্তু সখিগণের কি যে অবিচিন্ত্য সামর্থ্য, তাঁহারা ছাড়া ঐ স্বপ্রকাশ বস্তুরও অভিব্যক্তি হয় না।

এইরূপ হইবার একটি কারণ হইল এই যে, শ্রীরাধা এবং নিত্যসিদ্ধা সখিগণ অভিন্না। সখিগণ মহাভাবময়ীর প্রতিবিম্ব-স্বরূপা। শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কল্পলতা। সখিগণ

ঐ লতার পল্লব-পুষ্প-পাতা। সখিগণ স্বরূপাশক্তির বৃত্তি বলিয়া তাঁহাদের সেবা রাগাত্মিকা ও স্বাতন্ত্র্যময়ী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ হইতে ঐ সেবার লালসা। তাঁহারা যেমন ভাবে ইচ্ছা করেন তেমনই ভাবে যুগলকিশোরের লীলা প্রকটিত করিয়া পুষ্টি-বিধান করিতে পারেন।

ললিতা, বিশাখা ও বৃন্দা এই তিনটি সখীর রহস্যময় সেবা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর কোন অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্তকে লিখিয়াছিলেন—

"সখী ললিতা॥—ইনি রাধামন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি প্রেমের কার্য্য করেন। ইনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন। কেননা, পাছে শ্রীমতী কাঁদিয়া উঠেন, এই জন্য। ইনি প্রেমের পথের। ইহার ডাক "মাধব"। ইনি শ্রীমতীকে "রাই" বলিয়া ডাকেন। ইনি শ্যামকে রাধা মন্ত্রে দীক্ষা দেন। ইনি শ্যামের গুরু, আবার দাসীও। সকলের শ্রেষ্ঠ আদিরস। তাহাতে প্রেমে আত্মসুখ বিস্মৃতি। ইহার চেষ্টা, কিসে রাইয়ের আনন্দ হয়, কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে। ইহার হইল রাইজীবন।"

"বৃন্দা সখী॥ ইনি যুগলমন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি ভক্তির কার্য্য করেন। ইনি কুঞ্জেতে মিলনের কাজ সমাধা করিয়া যুগল শয়ন দিয়া শয়ন করেন। ইনি ভক্তিপথের। ইহার ডাক "গোবিন্দ"। শ্রীরাধাকে ইনি "শ্রীমতী" ডাকেন। ইহার চেষ্টা, কিসে যুগল মিলন হবে। ইহার হইল যুগলজীবন।"

"সখী বিশাখা॥—ইনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি জ্ঞানের কার্য্য করেন। কুঞ্জেতে ইনি সকলের আগে শয়ন

করেন। ইনি অনুরাগিণী। ইঁহার ডাক "হরি"। শ্রীমতীকে ইনি "রাধা" বলিয়া ডাকেন। ইঁহার চেষ্টা, কিসে রাই শ্যামকে সাধিতে আসিবে। ইঁহার হইল কৃষ্ণজীবন।"

স্বরূপাশক্তির বৃত্তিগণ কিভাবে নিত্যকাল সেবা করেন তাহার কিঞ্চিৎ সঙ্কেত করা হইল। জীব স্বরূপাশক্তি নহে। সুতরাং তাঁহাদের মত সেবায় কোনকালেই অধিকার হইবে না। আনুগত্যময়ী সেবাতেই দাসীর যোগ্যতা। রাগাত্মিকা সেবার আনুকূল্যবিধান-রূপ সেবাতেই জীবের অধিকার। রাগাত্মিকা সেবার আনুগত্যময়ী সেবাই রাগানুগা। সাধক নিজেকে শ্রীরাধার দাসীর দাসী স্বরূপে স্থিত করিয়াই এই রাগানুগা ভজন করিয়া থাকেন। (রাগানুগা মার্গে সখ্য বাৎসল্য রসের আনুগত্যময়ী সেবাও হইতে পারে। এখানে সাধ্যশিরোমণি রাধাভাবের প্রসঙ্গ বলিয়াই অন্য রসের বিষয় আলোচনার বাহিরে থাকিতেছে)।

সেবার প্রকার-ভেদে শ্রীরাধা-দাসীগণের দ্বিবিধ ভেদ— সখী ও মঞ্জরী। সখিগণ রাধাকল্পলতার পত্রপুষ্প-স্থানীয়া, আর মঞ্জরীগণ লতার জীবনী-শক্তি-স্বরূপা। শ্রীরূপগোস্বামী পাদ মঞ্জরীগণের স্বরূপ বিচারে লিখিয়াছেন—

"স্বসুরতবিমুখা রাধিকানন্দ-চেষ্টা"

শ্রীরাধার আনন্দ চেষ্টার মূর্ত্তবিগ্রহ মঞ্জরীগণ। স্বসুরত-বিমুখা" কথাটি বিশেষভাবে বিচারণীয়। সখিগণের স্বভাব বর্ণনায় শ্রীরামরায় এক "অকথ্য কথন" কহিয়াছেন।—

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥"

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজে স্বতন্ত্র ভাবে মিলিত হইয়া যে আনন্দের আস্বাদন করা যায়, তাহা কোন সখীই কামনা করেন না। সংসারে সকলেই কৃষ্ণকে চায়। কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে চায়। সখীরা তাহা চান না। তাঁহারা কৃষ্ণ চান না। কৃষ্ণ সঙ্গও চান না। তাঁহারা চান কৃষ্ণসুখ। তাঁহারা মনে করেন আমরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে তাঁহার যে সুখ হইবে তদপেক্ষা অধিকতর সুখের উদয় হইবে শ্রীরাধা সহ মিলিত হইলে। এই জন্য তাঁহারা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে মিলন করাইয়াই নিজ মিলন অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥

এবম্ভূত নিজ-সুখ-বাসনার গন্ধমাত্রবর্জ্জিত কোন নায়িকা হইতে পারে ইহা কল্পনা করাও কঠিন। তাই অনির্ব্বচনীয় গোপীকার স্বভাব।

শ্রীরাধিকার প্রেমেও বিন্দুমাত্র নিজসুখের অভিলাষ নাই। তিনি যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন, তাহা কৃষ্ণেরই সুখের জন্য। তাই শ্রীরাধাও কখনও কখনও মনে করেন যে, তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণকে যে সেবাসুখ দিতেছেন, তদপেক্ষা অধিক সুখ তাহাকে গোপীকাগণ দিতে পারে। সেই জন্য সখীর স্বাধীন ভাবে কৃষ্ণ সঙ্গে মিলিত হইবার বাসনা না থাকিলেও শ্রীরাধা নানা-

প্রকার যত্ন করিয়া বা ছল করিয়া সখিগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন সাধন করেন। ঐরূপ করিয়া নিজ কৃষ্ণসেবা হইতে কোটিগুণ অধিক সুখ ভোগ করেন।

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায়॥"

শ্রীরাধা কৃষ্ণকে ছল করিয়া সখী সন্নিধানে প্রেরণ করেন। তাহাদের সঙ্গে মিলনের সুযোগ করেন। যে-সখীদের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইল তাঁহাদের নিশ্চয়ই কৃষ্ণসঙ্গে মিলিত হইবার ও স্বাধীন ভাবে সুখবিধান করিবার যোগ্যতা আছে। লতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইলেও পত্র পুষ্পের কিঞ্চিৎ নিজ স্বাতন্ত্র্যও আছে। তদ্রূপ সখিগণের নিজ স্বতন্ত্র অধিকার বা যোগ্যতা আছে। তাঁহারা ঐ অধিকার বা যোগ্যতার ব্যবহার করিতে চাহেন না। তথাপি শ্রীরাধা করান। এই কথাই বলা হইল।

সখিগণ সঙ্গে মঞ্জরীগণের পার্থক্য এই বিচারে। মঞ্জরীগণ সর্ব্বতোভাবেই "স্বসুরতবিমুখা।" শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বতন্ত্রভাবে মিলন বিষয়ে তাহারা একান্ত ভাবেই বিমুখ। তাহাদের যেন ঐ অধিকার বা যোগ্যতাই নাই। পত্র পুষ্পের লতা ছাড়াও সত্তার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু লতার জীবনীশক্তির লতাছাড়া বিদ্যমানতাই নাই। জীবনীশক্তি দ্বারেই লতার জীবন। কাহারও পৃথক হইবার যোগ্যতা নাই।

শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধার রূপের মূর্ত্তি। শ্রীরসমঞ্জরী শ্রীরাধার

রসের মূর্ত্তি। শ্রীগুণমঞ্জরী শ্রীরাধার গুণরাশির ঘনমূর্ত্তি। রতিমঞ্জরী শ্রীরাধার কৃষ্ণরতির বিগ্রহরূপিনী। রাগমঞ্জরী শ্রীরাধার অনুরাগের ঘনীভূত-প্রতিমা। বিলাসমঞ্জরী শ্রীরাধার বিলাসের প্রকট বিগ্রহ। নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীরা সবাইর স্বরূপই এই রূপ অভিন্ন।

লতার রূপ রস গুণ যেমন লতা হইতে একেবারেই পৃথকভূত হইতে পারে না, তদ্রূপ মঞ্জরীগণের শ্রীরাধা হইতে পৃথকভাবে অবস্থিতিরই সম্ভাবনা নাই। শ্রীরাধা হইতে পৃথকভাবে কৃষ্ণসহ মিলিত হইবার যোগ্যতা, সখীগণকে নিভৃত সেবা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অযোগ্য করে। পক্ষান্তরে রাধা হইতে পৃথক-ভাবে কৃষ্ণসহ মিলিত হইবার অযোগ্যতা, মঞ্জরীগণকে গূঢ় সেবা বিষয়ে অধিকতর যোগ্য করে।

অতএব অন্তরঙ্গ সেবায় সখী অপেক্ষা মঞ্জরীগণের অধিকার অনেক বেশী। সখিগণ হইতে মঞ্জরীগণ বয়সে ন্যূন। শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিভৃত মিলনকালে সখিগণ কিছু সময় গবাক্ষ পথে দর্শনের অধিকার পাইয়া থাকেন তৎপর নিজ নিজ কুঞ্জে বিশ্রামার্থ গমন করেন। কিন্তু মঞ্জরীগণ ঐকালেও কুঞ্জ-মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক উভয়ের মিলনানন্দের সংপুষ্টি বিধান করিয়া থাকেন।

মঞ্জরীগণের সমক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দ নিঃসঙ্কোচে নিভৃত নিকুঞ্জবিলাসাদি করিয়া থাকেন এবং ইঁহারা সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ই অন্তরঙ্গ সেবায় অধিকারিণী। ইঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যিক কোনপ্রকার রতি বিলাসাদি সম্বন্ধ না থাকিলেও

শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসাদি দর্শনে এই ভাবময়ীদের দেহে রতিচিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা এক নিগূঢ় নিরুপম রহস্যময় বার্ত্তা।

এই মঞ্জরীগণের আনুগত্যময় দাসীত্বেই জীবের প্রকৃত স্বরূপের পরাকাষ্ঠা অবস্থা বিরাজিত।

এই মঞ্জরীর দাসীত্ব স্বরূপটি জীবের যথার্থ। ইহা কাল্পনিক কিছু নহে। কাল্পনিক নহে বলিয়াই ভাবনা দ্বারা ইহার স্ফূর্ত্তি ও অনুভূতি হইতে পারে। যেমন একটি লোক বাঙ্গালীও ভারতবাসীও। সে যে বাঙ্গালী ইহা সে সর্ব্বদা জানে; কিন্তু সে যে ভারতবাসী ইহা ভুলেও মনে করে না। মনে না করিলেও, সে যে ভারতবাসী ইহা তো সত্যই কাল্পনিক কিছু নয়। কাল্পনিক নয়, সত্য বলিয়াই সে যদি পুনঃ পুনঃ নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া ভাবনা করে, ভাবিতে ভাবিতে একদিন ঐ অনুভবে নিশ্চয়ই স্থিত হইতে পারিবে।

তাই, সনাতন শিক্ষায় মহাপ্রভু রাগানুগা সাধনের রহস্যময় পন্থা কহিতেছেন—

"মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

সিদ্ধদেহ বলিতে মঞ্জরী-দাসীঅভিমানবিশিষ্ট দেহ। এই দেহ জীবের সচ্চিদানন্দময় মাধুর্য্যঘন দেহ। ইহা তার আছেই আছে। এতৎ সম্বন্ধে কোন ভাবনা সে করে না বলিয়াই, নাই বলিয়া মনে হয়। মনে মনে ঐ নিজ দেহের কথা চিন্তা করিতে হইবে। এই জন্য ঐ দেহকে অন্তশ্চিন্তিত দেহও বলা হয়।

এই দেহই গোপীদের প্রেমঘন ভাবদেহ। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শ্রীহরিকথায় লিখিয়াছেন—

"গোপীভাব লও রে
গুরুগতি, কৃষ্ণপতি"

এস্থলে গুরুপদে মঞ্জরী। মঞ্জরীর আশ্রয় লইয়া তাঁহার দাসী অভিমানে কৃষ্ণপতির সেবা করিতেছি এইমত ভাবনা করিতে হইবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিয়াছেন,—

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হইয়া॥"

যিনি মনকে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের ভাবনায় নিমজ্জিত করিতে পারিয়াছেন তিনিই অন্তর্ম্মনা। অন্তর্ম্মনা হইয়া সাধক নিজ প্রিয়তম যে কৃষ্ণ, তাঁর যে প্রিয়তমা গুরুরূপা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি, তাঁহাদের পাছে পাছে থাকিয়া অনুগত হইয়া "লাগিয়া" রহিয়া সেবা করিবে।

তথা শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের পদ,—

"গুরুরূপা সখী বামে নেহারি নয়নে।
নিরবধি রহিব চরণ সেবনে॥
"ভনে জগদ্বন্ধু দ্বিজ, কবে দোঁহ মুখাম্বুজ,
হেরিব সখীর পাশে বসি।
(সখীর পাশেতে রহি) (মঞ্জরীর হাত ধরি)
(অশ্রুনীরে অঙ্গ ভরি) (হের্‌ব যুগল রূপ মাধুরী)"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহাদান—রহস্যময় সাধনের কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করা হইল মাত্র।

পূর্ব্ব সাধনতত্ত্ব প্রসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনকে সাধন বলা হইয়াছে। এই রাগমার্গীয় ভজনে তাহার স্থান কোথায়, এ সম্বন্ধে শ্রীগৌর-হরির শ্রীমুখোক্তি—

"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥"

বাহ্যদেহের শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সাধনের সহিত সিদ্ধদেহের আনুগত্যময়ী সেবা-সাধনার একটি গূঢ় যোগাযোগ আছে। যোগটি সিদ্ধ হয় লোভের দ্বারে।

যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণানুরাগ আছে এমন ভক্তের মুখে ব্রজের রাগাত্মিকা ভক্তির প্রেমময় লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে তদনুরূপ সেবা পাইবার জন্য যদি কাহারও চিত্তে লোভের উদয় হয়—"সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়" সেই ব্যক্তিই রাগানুগামার্গে তাঁহাকে ভজন করিতে পারে। লোভোৎপত্তির মাধ্যমে অন্তর বাহ্য সাধনের-সম্পর্ক।

বাহিরে সাধক-দেহেরও ভজন উপদেশ দিয়াছেন—শ্রীশ্রীবন্ধু-সুন্দর কোন প্রিয়জনকে বলিয়াছিলেন—

"অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবাহন করিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ অর্চ্চিও, ডাকিও, কাঁদিও, গাইও, জপিও, সেবিও, বাসিও, আপন করিও।"

বাহিরের সাধনে প্রিয়তম "আপন" হইবে। অন্তরের ভজনে আপনজনের সেবায় আনুগত্যময়ী তন্ময়তা আসিবে। মঞ্জরী চাহে শ্রীরাধার সুখ। শ্রীরাধা চাহেন শ্রীকৃষ্ণ-সুখ। সাধক রাধাদাসী মঞ্জরীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিবে।

আনুগত্যময়ী একাত্মতায় কিশোরী সঙ্গে কিশোরের নিত্য মিলনানন্দ, আপনি আস্বাদন করিবে।

বাহ্য ও অন্তর ভজনের এতদপেক্ষাও গভীরতর যোগাযোগ আছে। বহিরঙ্গ নামকীর্ত্তন ও অন্তরঙ্গ রসাস্বাদন এই দুইকে মহাপ্রভু ওতপ্রোত ভাবে মিলাইয়া রহস্যময় এই সাধনকে অখণ্ড রূপ দিয়াছেন।

"নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার।"

সাধন নাম ও সাধ্য রাধাপ্রেম, এই দুইকে এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিতে আনিয়া অখণ্ডরূপতা আধান করিয়াছেন শ্রীগৌরহরি। আমরা ক্রমে তাহা আলোচনা করিব। উহা আলোচনা করিতে হইলে পূর্ব্বে তিন-বাঞ্ছা-লোভী গৌরসুন্দরের নিত্য নবায়মান মধুর স্বরূপতত্ত্বটি আস্বাদনপূর্ব্বক ভোগ করিতে হইবে। বন্ধুকৃপাহি কেবলম্।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিন বাঞ্ছার সুধা-মাধুর্য্য আস্বাদনের সাধ রহিল।

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীহরিকথা	৩.০০
চন্দ্রপাত	.২০
উদ্ধারণ	১.০০
সংকীর্ত্তন-পদাবলী	.৭৫
সংকীর্ত্তন-পদামৃত	১.২৫
চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু	২.০০
মহামৃত্যু-রঙ্গ	২.০০
মহাকীর্ত্তন মাধুরী	.৫০
শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী ১ম—১০ম খণ্ড	২৭.৫৫
বন্ধুবার্ত্তা	৫.০০
ব্রহ্মগায়ত্রী	.৬০
উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ	৩.০০
শ্রীশ্রীবন্ধুস্মরণ মঙ্গল	.৭৫
স্মরণ-মঞ্জরী	.৩৭
বিশ্বধর্ম্ম	.২৫
শ্রীশ্রীবন্ধু স্তোত্র রত্নাবলী	.২০
গৌরকথা ১ম খণ্ড	২.০০
২য় ২.৫০, ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ	
শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী	১.৫০
শ্রীগৌরস্মরণ মঙ্গল	১.০০
শ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল	.৭৫
শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন	১.৫০
রাধাকৃষ্ণ স্মরণ মঙ্গল	.৫০
গোপীমন্ত্র মাধুরী	.৫০
বন্ধুগীতি কুসুমাঞ্জলি	.৭৫
বন্ধু কে ?	.৫০
বন্ধুকরুণা কণিকা	.৫০
মহানাম মহাকীর্ত্তন আস্বাদন	.২০
আমেরিকা পথে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	১.৫০
মিশনারী ও ভারতীয় সাধু	.৫০
প্রেমের বাণী	.৫০
ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতিঃ	.৫০
প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধু	১.২৫
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু	.৭৫
গীতাধ্যান ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ খণ্ড	১৪.৫০
সপ্তশতী চণ্ডীচিন্তা	৪.০০
উদ্ধব-সন্দেশ	৩.০০
বন্ধুলীলা সুধানিধি ১ম খণ্ড ৩.০০, ২য় খণ্ড	৩.৫০
ভাগবত ১ম খণ্ড	১৫.০০
,, ২য় ,,	৮.৫০
,, ৩য় ,,	৮.৫০
,, ৪র্থ যন্ত্রস্থ	
মহানামব্রতের পাঁচটী ভাষণ	২.৫০
জয়নিতাইদেবের ইষ্টগোষ্ঠী	১.০০
শতবার্ষিকী স্মরণিকা (বাংলা)	৬.৫০
ঐ স্মরণিকা (ইংরেজী)	১০.০০

প্রাপ্তিস্থান

মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১। মহানাম মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। ভাগবত সঙ্ঘ, ১৬/সি, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯। ফোন : ৪৬-১৪৫৮ মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বন্ধুপ্রিয়া পুস্তক ভাণ্ডার, ৭, তালতলা লেন, কলিকাতা-১৪।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৬